HISTORY OF CHANDRADWIP

BY

Brindabon Chandra Putatunda.

চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস।

বঙ্গদেশস্থ চন্দ্রদ্বীপ-রাজ্যের প্রাচীন ও আধুনিক
কালের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড-প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-বরিশাল-শাখার উৎসাহ ও
অনুমোদনে প্রকাশিত।

১৩২০।

বরিশাল-কাশীপুর যন্ত্রে
শ্রীতারিণীচরণ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
সন ১৩২০। ১২ই ভাদ্র।

মূল্য—১ ৲ টাকা।

ছাত্রদের জন্য অর্দ্ধ মূল্য ||৹ আনা।

১৭৫০

বিজ্ঞাপন।

চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস প্রকাশিত হইল। এ জিলার প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবী জমিদার শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দেবকুমার রায়চৌধুরী মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টার ফলে বিগত ১৩১৮ সালের ১৬ই আষাঢ় তারিখে বরিশাল টাউনে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের একটী শাখা-সভা স্থাপিত হয়। উক্ত শাখা-সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত বাবু নিবারণচন্দ্র দাসগুপ্ত এম্ এ, বি এল্ মহাশয় উক্ত শাখা-সভার সভ্যগণকে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলে গত ১৩১৮ সালের মাঘ মাসে "চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ" নামক একটী শীর্ষক প্রবন্ধ গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পঠিত হয়। উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করার পরে শাখা-পরিষদের উৎসাহী সভ্য শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদকান্ত বসু বি, এল্, প্রমুখ কতিপয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্য গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করেন। গ্রন্থকার এই পুস্তিকার প্রচার ও প্রকাশ করিতে আপনাকে অযোগ্য বলিয়াই জানিতেন, কিন্তু প্রাগুক্ত কতিপয় লব্ধ-প্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণের ঐকান্তিক আগ্রহ ও উৎসাহে তিনি এই দুরূহ দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন; এজন্য প্রোক্ত উৎসাহী মহাত্মাগণ নিকট গ্রন্থকার চির-কৃতজ্ঞতাপাশেবদ্ধ রহিলেন, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র।

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহ জন্য শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত "মহারাজ প্রতাপাদিত্য", শ্রীযুক্ত আনন্দনাথ রায় প্রণীত ফরিদপুরের ইতিহাস ও বারভূঞা, শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেন প্রণীত নোয়াখালীর ইতিহাস, পরলোকগত খোসালচন্দ্র রায় এবং মিঃ বেভারিজ সাহেবকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাস, শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কৃত কাশীপুর-কুসুম, প্যারীমোহন দাসকৃত মনসামঙ্গল, স্বর্গীয় ব্রজসুন্দর মিত্র প্রণীত চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ এবং ইম্পেরিয়াল গেজেটীয়ার প্রভৃতি কতিপয় ইংরেজী পুস্তক তদ্ব্যতীত সংস্কৃত—ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ড, দিগ্বিজয়-প্রকাশ-বিবৃতি নামক কতিপয় প্রাচীন পুস্তক এবং চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশীয় জনৈক বৃদ্ধ ঘটক হইতে প্রাচীন

কায়স্থকারিকা, ভক্তির প্রবাসী, পল্লীচিত্র, ঢাকা রিভিউ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকা হইতে কতক সাহায্য গ্রহণ করা হইয়াছে।

চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকারী ভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচারিগণ মধ্যে জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ হইতে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়াছি এবং যেরূপভাবে সত্য উপকরণ গুলী সংগ্রহ হইতে পারে তদ্বিষয় উপদেশ পাইয়াছি, তজ্জন্য উক্ত বৃদ্ধের নিকট চির কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম।

[illegible] ডিপুটী কালেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হরকিশোর বিশ্বাস মহাশয় [illegible] পূর্ব্বে [illegible] জারপী নক্সা হইতে প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপের [illegible] একখানি নক্সা সঙ্কলন করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। [illegible]লের খাসমহল ডিপুটী কালেক্টর শ্রদ্ধেয় মৌলবী আবদুললতিফ সাহেব বি এ, বি এল্ মহাশয় নিজ ব্যয় চন্দ্রদ্বীপ রাজবাড়ী হইতে কাত্যায়নী ও মদনগোপালের প্রাচীন দুটী ঝিকটী মন্দিরের ফটোগ্রাফ তুলিয়া আনিয়া ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় প্রদান করার জন্য আশ্বাস দিয়াছেন।

এই পুস্তিকার ৬৭ পৃষ্ঠায় যে কামানের কথা উল্লেখ আছে; স্থানীয় সহৃদয় ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এফ্ ডব্লিউ ষ্ট্রং আই, সি, এস্ মহোদয় ঐ কামানটী শাখা-পরিষদ্‌কে অর্পণ করায়, শাখা-পরিষদের শ্রদ্ধেয় সম্পাদক উক্ত কামানটী আনিয়া পরিষদ্ আফিস-প্রাঙ্গণে রাখিয়া দিয়াছেন। প্রাসঙ্গিক বিধায় এস্থলে উহার উল্লেখ করা গেল।

গ্রন্থ মুদ্রণ সময় গ্রন্থকারের নিজের বৈষয়িক ও পারিবারিক অশান্তির জন্য বিশেষ মনযোগ বিধান করিতে না পারায় রীতিমত প্রুফ দেখা হয় নাই; সুতরাং গ্রন্থের স্থানে স্থানে মুদ্রাকরের ত্রুটিতে দু'একটী ভুল লক্ষিত হইবে, বারান্তরে উহা সংশোধন করিবার আশা রহিল; এবারের ভ্রম-প্রমাদ পাঠকগণ স্বীয় ঔদার্য্যগুণে ক্ষমা করিয়া লইবেন। ইতি

বরিশাল }
বঙ্গাব্দ ১৩২০, ১০ই ভাদ্র। } গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিবিধ বিবরণ।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস।

উপক্রমণিকা।

অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষ এবং তন্মধ্যস্থ বঙ্গভূমি হিন্দু রাজগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছিল। ১২০৩ খৃষ্টাব্দ এবং ৬১০ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত হিন্দুরাজগণ নিরাপদে বঙ্গভূমি শাসন করিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু, তৎপরেও সমগ্র বঙ্গভূমিতে দ্বাদশ জন নরপতি ছিলেন। তাঁহারা বারভুঁঞা নামে বিখ্যাত ছিলেন। উক্ত বারভুঞাগণ বখ্‌তিয়ার খিলিজী কর্ত্তৃক বঙ্গভূমি অধিকারের সময় হইতে মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগ পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। উক্ত দ্বাদশ নরপতির মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্প-নারায়ণ রায় দ্বিতীয় স্থানীয় রাজা ছিলেন। (৩য়) বিক্রমপুরের চাঁদ রায় কেদার রায়। (৪র্থ) ভূষণার মুকুন্দরাম রায়। (৫ম) ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য। (৬ষ্ঠ) খিজিরপুরের ইসা খাঁ মসনদ আলী (পিতা কালিদাস) ইহার সন্ততিগণ বর্ত্তমানে জঙ্গলবাড়ী ও হয়বৎপুর নগরে বাস করিতেছেন। (৭ম) ভাওয়ালের রাজা শিশুপাল, ইঁহাকে ফাজেলগাজী দীল্লি হইতে আসিয়া জয় করিয়া তথাকার রাজত্ব প্রাপ্ত হন। (৮ম) বিষ্ণুপুরের হাম্বিরমল্ল। (৯ম) তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণ। (১০ম) দিনাজপুরের রাজা গণেশের বংশধর। (১১শ) রাজসাহী জিলার পুঠিয়ার রাজা; (১২শ) পাবনার রাজা। *

---

* কেহ কেহ পাবনার রাজার পরিবর্ত্তে সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণের কথা বলেন। সাতৈল পাবনা জিলার অন্তর্গত চাটমহল থানার মধ্যে একটী গ্রাম। উল্লিখিত (৮ম) রাজা হাম্বিরমল্লের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ চাঁদ প্রতাপ পরগণার চাঁদগাজীর কথা উল্লেখ করেন।

উপরোক্ত দ্বাদশজন নরপতি মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের সেনাপতি মানসিংহের হস্তে বন্দী হন এবং তদবধি যশোহরের গৌরব-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হয়। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ জাহাঙ্গীরের রাজত্বের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রকৃত স্বাধীন রাজা ছিলেন; তৎপর নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর সময় পর্য্যন্ত করদভাবে পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন; কিন্তু, ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভে চন্দ্রদ্বীপের অবস্থা নানা কারণে একান্ত শোচনীয় অবস্থায় পরিণত হয়। ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ প্রথম বাখরগঞ্জ নামধেয় জনপদগুলি অধিকার করে। তৎপূর্ব্বে এ প্রদেশে তাঁহারা চন্দ্রদ্বীপ রাজের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই। মুসলমান কর্ত্তৃপক্ষ খৃষ্টাব্দ ১৫৭৪ এবং বঙ্গাব্দ ৯৮১ সালের পরেও মধ্যে মধ্যে নাম মাত্র কর গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন; ফলতঃ প্রকৃত পক্ষে যাবতীয় শাসন কার্য্য রাজার হস্তেই ন্যস্ত ছিল। উক্ত চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি স্থিতি এবং রাজবংশের ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উদ্দেশ্য।

প্রস্তাবিত ইতিহাস বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জিলার একটী পরগণার ইতিহাস মাত্র; যদিও বর্ত্তমান চন্দ্রদ্বীপ বরিশাল জিলার একটী মাত্র পরগণা; কিন্তু, এই চন্দ্রদ্বীপের অধিপতি অতীতের অদূরবর্ত্তীকালে বঙ্গদেশের সমগ্র বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালী এবং খুলনা জিলার অধীশ্বর ছিলেন। ইঁহাদের রাজত্বকাল বহু বিচিত্র ঘটনাসমূহে পূর্ণ ছিল। চন্দ্রদ্বীপের রাজা এবং ইহার রাজত্বকালের ঘটনা বাদ দিলে বাখরগঞ্জের ইতিহাস প্রাণহীন হইয়া পড়ে। এই স্বাধীন নৃপতিবৃন্দের রাজত্বের বিবরণ ও পৌরাণিক আখ্যায়িকা শুধু বরিশালবাসীর কেন সমগ্র বঙ্গবাসীর জানিবার ও শুনিবার বিষয়; যেহেতু, ইহার অশ্রুতপূর্ব্ব প্রকৃত তথ্যমূলক ঘটনাগুলি

জনসমাজে প্রচারিত হইলে নব্য শিক্ষিত সমাজের বিস্ময় উদ্রেক করিবে। আমরা ইংলণ্ডের রাজা, গ্রীকের রাজা এবং ভারতবর্ষীয় মুসলমান রাজগণের রাজত্বের সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুখে বলিতে পারি; ফরাসী দেশের প্রসিদ্ধ বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টির জীবনের স্থূল বিবরণগুলি কণ্ঠস্থ করিতে পারি; কিন্তু, নিজ জন্মভূমির পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে কান্দিনারায়ণ নামে চন্দ্রদ্বীপের জনৈক অধীশ্বর যে প্রধান যোদ্ধা ছিলেন এবং উদয়নারায়ণ নামে একজন পরম দানশীল নরপতি ছিলেন তাঁহাদের নামটিও অবগত নহি, ইহা কি পরিতাপের বিষয় নহে? বাখরগঞ্জের দুর্ভাগ্য; তাই, এহেন রাজবংশের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত কুত্রাপি রক্ষিত হয় নাই। তথাপি এক্ষণও যতদূর অনুসন্ধানে জানা যাইতে পারে, তাহাতেও যথেষ্ট জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বাখরগঞ্জের ভূতপূর্ব্ব মাজিষ্ট্রেট কালেক্টর, বেভারিজ এবং পরলোকগত খোসালচন্দ্র রায় বাখরগঞ্জের যে ইতিহাস লিখিয়াছেন, তাহাতে এ জিলার অবশ্য-জ্ঞাতব্য চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস সম্বন্ধে যেরূপ সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছেন তাহা যথোপযুক্ত হয় নাই, ইহা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। তদ্ভিন্ন, পরলোকগত প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবী স্বর্গীয় রোহিণীকুমার রায় চৌধুরী বাখরগঞ্জের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে কতদূর কি লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা অদ্যাপি প্রকাশ পায় নাই। আশা করি, এবম্বিধ আলোচনায় চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধীয় কতিপয় অতীত ঘটনা সর্ব্বজন সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইলে সমগ্র বঙ্গের না হইলেও বরিশালবাসিগণের আংশিক বিস্ময়োৎপাদন করিতে পারিবে। অলমিতি বিস্তারেণ।
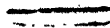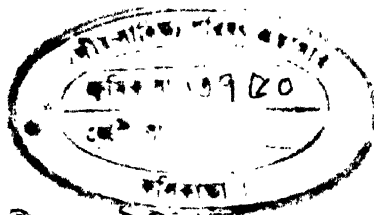
চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস।

প্রথম অধ্যায়।

সীমা-নির্ণয়।

পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা বিভাগস্থ বর্ত্তমান বরিশাল, ফরিদপুর এবং নোয়াখালী জিলা এবং বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী বিভাগের খুলনা জিলার অধিকাংশ স্থান চন্দ্রদ্বীপ নামধেয় রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। "দিগ্বিজয় প্রকাশ বিবৃতি" নামক সংস্কৃত ভৌগোলিক গ্রন্থের এক স্থানে ইহার সীমা সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে ;—

পূর্ব্বে ইছামতী সীমা পশ্চিমে চ মধুমতী
বাদাভূমি দক্ষিণে চ কুশদ্বীপোহি চোত্তরে ॥
সমন্তাৎ যাস মার্গস্ত শাস কোহয়ম্ মহীপতিঃ।

(৬২১ শ্লোক)।

পূর্ব্ব সীমা ইছামতী, পশ্চিমে মধুমতী নদী, দক্ষিণে বাদাভূমি, এবং উত্তরে কুশদ্বীপ।

আবার ঐ গ্রন্থে বাঙ্গলার বর্ণনা স্থলে বর্ণিত আছে ;—

মেঘনানদী পূর্ব্বভাগে পশ্চিমে চ বলেশ্বরী।
ইন্দিলপুরী যক্ষ সীমা দক্ষিণে সুন্দরং বনং ॥

ত্রিংশৎ যোজন বিমিতো সোমকান্তাদ্রি বর্জ্জিতঃ।
সোমকান্তে চ দ্বৌ দেশৌ বিখ্যাতৌ নৃপশেখরঃ॥
জম্বুদ্বীপ পশ্চিমে চ স্ত্রীকারোহি তথোত্তরে
বাকলাখ্যো মধ্যভাগে রাজধানী সমীপতঃ॥

পূর্ব্ব সীমা মেঘনা নদী, পশ্চিমে বলেশ্বরী নদী, উত্তরে ইদিলপুর, দক্ষিণ ভাগে সুন্দরবন; ইহার মধ্যে গিরি-বর্জ্জিত সোমকান্ত। ইহার পরিমাণ ৩০ যোজন। সোমকান্তের মধ্যে আবার দুইটী জনপদ আছে;—পশ্চিমে জম্বুদ্বীপ, উত্তরভাগে স্ত্রীকার, মধ্যভাগে বাক্‌লা নামক রাজধানী।

আকবর বাদসাহের সময় বঙ্গদেশের মধ্যে বাক্‌লা পাঁচটী অংশে বিভক্ত ছিল। যথা—(১) সরকার বাক্‌লা, (২) ইস্‌মাইলপুর, (৩) শ্রীরামপুর (৪) সাহাবাদপুর, (৫) ইদিলপুর বা অলীপুর (ইদিলপুর)। এই বাক্‌লাতে ১৫০০০ পদাতিক ও ৩২০ গজ থাকিত এবং বাক্‌লা হইতে ৭১৫০৬০৫ দাম অর্থাৎ ১৭৮৭৬৷৷১৫ আনা কর গ্রহণ করা হইত।

(আইন--ই—আকবরী)।

"ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডে" চন্দ্রদ্বীপস্থ কয়েকটী নগর ও গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়; যথা—ব্রহ্মপুর (নগর), বারাণসীপুর, সহস্রশাল, নালিকা সরিৎ পার্শ্বে কুমুদ গ্রাম, কোটালী, কাকিনী গ্রাম, কণ্ঠস্থালী, বেণুবাটী, রণানদীর নিকট ডম্বুর, চেদীনগর, যাদবপুর, বেত্রগ্রাম, তেলীগ্রাম, ধূলগ্রাম, কাকুলগ্রাম, সুরাগ্রাম, মাধবপার্শ্ব ও পিঙ্গলপত্তন। (ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড। ১৩ শ্লোক)।

উপরোক্ত প্রধান নগর বা গ্রামগুলির মধ্যে মাধবপার্শ্ব যে বর্ত্তমান মাধবপাশা এবং কোটালী বর্ত্তমান কোটালীপাড়া, ইহা নিশ্চিত; এবং ধুলগ্রাম বর্ত্তমান ফরিদপুর জিলার একটী সমৃদ্ধিসম্পন্ন গ্রাম। অবশিষ্ট গ্রাম বা নগরগুলি যে বর্ত্তমান নোয়াখালী এবং খুলনা জিলার অন্তর্গত গ্রাম হইবে তাহা বলা বাহুল্য।

পূর্ব্ব সীমা।

"দিগ্বিজয় প্রকাশ বিবৃতি" নামক গ্রন্থে পূর্ব্ব সীমানায় ইছামতী নদী থাকায় নোয়াখালী যে পূর্ব্ব সীমানায় ছিল তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। রাজা রামচন্দ্র রায় ভুলুয়ার (নোয়াখালীর) রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া, চন্দ্রদ্বীপের রাজধানীতে আনয়ন করেন। তদবধি ভুলুয়া প্রদেশ (নোয়াখালী) চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের শাসনাধীন হয়। সুতরাং, বর্ত্তমান নোয়াখালী যে চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত ছিল ইহা সুনিশ্চিত। আরও একটী কারণ এই মতের সমধিক সমর্থন করে; তাহা এই—

প্রথমতঃ, ভুলুয়ার (নোয়াখালীর) অনেক ব্রাহ্মণের বৃত্তি-ব্রহ্মত্র এবং শিষ্য চন্দ্রদ্বীপের নানা স্থানে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। রহমৎপুরের শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ এ জিলার খ্যাতনামা ভূমাধিকারিগণ উক্ত ভুলুয়ার ঠাকুরদের শিষ্য; এ ভিন্ন এ জিলায় তাঁহাদের আরও অনেক শিষ্য ও যজমান আছে। *

দ্বিতীয়তঃ, কোতালী ষ্টেসনাধীন রায়পাশা লস্কর বাড়ীর দক্ষিণাংশে এক কায়স্থের বাড়ী আছে, তাঁহারা গুহবংশসম্ভূত। বহুকাল হয় এই বংশের কোন লোক এই জিলা হইতে নোয়াখালীতে বিবাহ করিয়া, তথায় বাস করিতেছিল। এক্ষণ তাঁহাদেরই কোন বংশধর আসিয়া পুনরায় রায়-পাশাতে বসতি করিতেছেন। বরিশালের কুলীন কায়স্থ-প্রধান গাভা গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার ঘোষ ও শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার ঘোষ ভুলুয়া

---

* ভুলুয়ার আনন্দশঙ্কর, হরিশঙ্কর ও উমাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য চন্দ্রদ্বীপের কোন রাজার গুরু ছিলেন।

পরগণার দত্তপাড়া গ্রামে দেওয়ানবাড়ী বিবাহ করিয়াছেন। কাশীপুর গণপাড়া পল্লীর পরলোকগত চণ্ডীচরণ ঘোষ এবং দক্ষিণ কাশীপুর নিবাসী বাবু শ্রীশচন্দ্র গুহ নোয়াখালী ভুলুয়ার কায়স্থ পরিবারে বিবাহ করিয়াছেন। সুতরাং চন্দ্রদ্বীপ রাজার রাজত্ব সময় যে এই জিলাস্থ কায়স্থগণ মধ্যে কেহ কেহ তথায় গিয়া বিবাহাদি সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহের কারণ নাই; অনুসন্ধান করিলে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অতএব তত্রতা ব্রাহ্মণগণের এবম্বিধ শিষ্য-যজমান ও বৃত্তি-ব্রহ্মত্র পাওয়া এবং এ জিলাস্থ চন্দ্রদ্বীপ সমাজের কায়স্থগণের বিবাহাদি ক্রিয়া প্রভৃতি নানা কারণে চন্দ্রদ্বীপবাসিগণ সহ যেরূপ সম্বন্ধ দেখা যায়, তদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রমাণ হইবে যে, একদা নোয়াখালী চন্দ্রদ্বীপ রাজার করতলগত ছিল, এবং তৎকারণেই ভুলুয়ার ব্রাহ্মণ প্রভৃতির সহিত চন্দ্রদ্বীপবাসিগণের এবম্বিধ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গিয়াছে। *

পশ্চিম সীমা।

(মধুমতী ও বলেশ্বরী নদী)।

বর্ত্তমান বলেশ্বর ও মধুমতী নদীর অধিকাংশ ভাগ যে খুলনা জিলার অন্তর্গত তাহা সম্ভবতঃ অনেকেই অবগত আছেন। যে চাক্‌শ্রী বা চাকসিরি পরগণা, রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের আমলে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যভুক্ত ছিল, এবং যে চাক্‌শ্রী পাওয়ার প্রত্যাশায় যশোহরের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত রাজা প্রতাপাদিত্য আপন দুহিতা বিন্দুমতিকে রাজা রামচন্দ্রের সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন; সেই চাক্‌শ্রী পরগণাই বর্ত্তমানে খুলনা জিলার অন্তর্গত।

* বর্ত্তমান নোয়াখালীর অধীন হাতিয়া সন্দ্বীপ ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের আমলেও বাখরগঞ্জের অন্তর্গত ছিল। ১৮২২ সালে উহা নোয়াখালী জিলাভুক্ত হইয়াছে।

সুতরাং, বর্ত্তমান খুলনা জিলার অধিকাংশ স্থান যে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যভুক্ত ছিল, তাহা জানা যাইতেছে। চাকৃসিরি নিতান্ত ছোট স্থান ছিল না। একটী প্রাচীন ছড়া আছে—"সাত রাত পাক্ ফিরি, তবু না পাই চাকৃসিরি।" মাননীয় শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় মহাশয় তাঁহার প্রতাপাদিত্যের জীবনীর ১০০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন--"বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা, যশোহর, খুলনা এবং বরিশাল জিলার মধ্যে কোন চাকৃসিরি নামক পরগণা কি স্থান নাই"; কিন্তু নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে ইহা সম্যক্ উপলব্ধি হইবে যে, চাকৃশ্রী নামক স্থান বর্ত্তমান খুলনা জিলারই অন্তর্গত। বিবরণটী এই—১৮৩২।৩৩ খৃষ্টাব্দে সুন্দরবনের সার্ভে কমিশনার ড্যাম্পিয়ার সাহেব সুন্দরবনের যে একটী ম্যাপ প্রস্তুত করেন, তাহাতে তিনি সে সময়ে যতদূর পর্য্যন্ত সমুদ্র তীরবর্ত্তী বাদাবন পাইয়াছিলেন, তাহার সীমানা নির্দ্দেশ করিয়া একটী রেখা অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই রেখার নাম ড্যাম্পিয়ার রেখা। এই রেখা হইতে ৫ মাইল উত্তরে পশারি ও মঙ্গলা নদীর সঙ্গমস্থল হইতে ১১ মাইল উত্তর পূর্ব্বে ধোতখালী নদীর কূলে পরগণা মধুদিয়ার অন্তর্গত চাকৃশ্রী গ্রাম বর্ত্তমান আছে। ইহার ধ্বংসাবশেষ দেখিলে ইহা যে একটী পুরাতন নগর বা সহর ছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। বর্ত্তমান খুলনা জিলার বাগেরহাট মহকুমা হইতে ৭।৮ মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বে এই চাকৃশ্রী নামক স্থান। ড্যাম্পিয়ার সাহেবের ম্যাপের রেখা দেখিলে বোধহয় ১৮৩২।৩৩ সালে এই স্থানসমুদ্রের নিকটবর্ত্তী ছিল; বর্ত্তমানে সমুদ্র ক্রমশঃ দক্ষিণে সরিয়া যাওয়ায় সমুদ্র হইতে এ স্থান পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যবধান হইয়াছে; কিন্তু এখনও সমুদ্র এ স্থান হইতে বড় বেশী দূর নয়। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ঈশ্বরপুরী রাজ্যের সীমানাও এই স্থান হইতে বহুদূরে নয়। সাধারণ লোকে এই স্থানকে "চাকৃসি" বলিয়া থাকে।

ঋজুপথে পূর্ব্ব ও পশ্চিম বঙ্গের প্রবেশ-দ্বার এবং সমুদ্র পথের প্রবেশ-দ্বার, প্রবল নদী বহুল স্থলে এই চাক্‌সিরি যে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের বৈবাহিক কন্দর্পনারায়ণ রায়ের চাক্‌সিরি ছিল, তদ্বিষয় অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দ ও ৯৬৮ বঙ্গাব্দে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয় এবং ১০১৩ বঙ্গাব্দে তাঁহার দেহান্তর হয়; মাত্র ৪৫ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই চন্দ্রদ্বীপ রাজ কন্দর্পনারায়ণের সহিত আত্মীয়তা করিয়া প্রতাপাদিত্য চাক্‌সিরি গ্রহণ করেন।

চাক্‌সিরির অনতিদূরে নৌবাহিনী স্থাপিত করিয়া খাঞ্জাহান আলীসা নামিক জনৈক মুসলমান উক্ত চাক্‌সিরির ৩।৪ মাইল ব্যবধান সুন্দরবনের মধ্যে মগরাহাট বা জাহাজঘাটা নামক স্থানে ভৈরবনদের উপর এক সৈনিক আবাস নির্ম্মাণ করেন। উক্ত খাঞ্জে আলীকে শাসন করা এবং সমুদ্র হইতে কোন জলদস্যু আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে উৎপাত করিতে না পারে, তজ্জন্য মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাঁহার বৈবাহিক চন্দ্রদ্বীপ-অধীশ্বর হইতে উক্ত চাক্‌সিরি গ্রহণ করেন। পূর্ব্ববঙ্গের কোন বণিক, বাণিজ্য-ব্যপদেশে পশ্চিম-বঙ্গে জলপথে যাইতে হইলেই চাক্‌সিরি ভিন্ন যাওয়ার আর গত্যন্তর ছিল না; সুতরাং আধুনিক খুলনা, যশোহর ও বরিশালে চাক্‌শ্রীর ন্যায় পূর্ব্বোক্ত সুবিধা-সম্পন্ন দ্বিতীয় স্থান আর ছিল না। বর্ত্তমান খুলনার হাবেলী পরগণার কায়স্থ প্রধান কাড়াপাড়া গ্রাম হইতে এই চাক্‌সিরি মাত্র ৩।৪ মাইল ব্যবধান; সুতরাং, এ হেন চন্দ্রদ্বীপস্থ চাক্‌সিরি নামধেয় প্রসিদ্ধ স্থান বর্ত্তমান খুলনা জিলার অন্তর্গত থাকায় পুরাকালে খুলনার অধিকাংশ স্থান যে চন্দ্রদ্বীপের রাজার করতলগত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ বলা যাইতে পারে। *

---

* ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বলেশ্বর নদের পশ্চিমপাড়স্থ কচুয়া ষ্টেসন এবং মোড়লগঞ্জ

সীমা-নির্ণয়।

দক্ষিণ।

(বাদাভূমি দক্ষিণেচ)।

বাদাভূমি শব্দে যে সুন্দরবন ইহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন, কারণ, অদ্যাপি কাষ্ঠ-বিক্রেতারা সুন্দরবনে যাইবার সময়ে "বাদাবনে যাই" ইহা সচরাচর বলিয়া থাকে।

উত্তর।

(কুশদ্বীপোহি চোত্তরে)।

জিলা ঢাকার দক্ষিণে সীতালক্ষার নিকট শঙ্খকোট ও তাহার দক্ষিণে কুশদ্বীপ নামে একটী দ্বীপের উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়; সুতরাং উহা যে বহু পূর্ব্বে পদ্মানদীস্থিত কোন দ্বীপ ছিল, তদ্বিষয় সন্দেহ নাই।

ফরিদপুর জিলার কথা।

বাখরগঞ্জ শব্দ সৃষ্টির পূর্ব্বে বাখরগঞ্জ নামধেয় জনপদগুলি বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ বলিয়াই প্রখ্যাত ছিল; মুর্শিদকুলিখাঁর শাসন সময়ে, উক্ত নবাবের জনৈক কর্ম্মচারী বোজরগমেদপুর পরগণা ও সেলিমাবাদ পরগণার কর্তৃত্ব নিয়া বোজরগমেদপুর পরগণার ভূমিতে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার নাম ছিল, আগাবাকর। ১৭০১ খৃষ্টাব্দে উক্ত আগাবাকর এই স্থানে বস-বাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নামানুসারেই বাকরগঞ্জ নাম হয়। বর্ত্তমান বাকরগঞ্জ থানা বোজরগমেদপুর পরগণার অন্তর্গত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান

থানার স্থানগুলি বাখরগঞ্জ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যশোহর জিলাভুক্ত হয়, পরে খুলনা নূতন জিলা হইলে বর্ত্তমানে খুলনার অন্তর্গত হইয়াছে।

বাকরগঞ্জ থানার ঠিক্ উত্তরাংশে বাখরগঞ্জ জিলা স্থাপিত হয়। এক্ষণ উক্ত জিলার স্থানসমূহ নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে; মাত্র একটী পুরাতন নারিকেল বৃক্ষ সামান্য স্থান নিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে বাখরগঞ্জ হইতে বরিশালে সদর কাছারী সংস্থাপিত হইয়াছে। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে বাকরগঞ্জকে ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া পৃথক্ জিলা বলিয়া ঘোষণা করা হয়। ইংরেজ অধিকারের পরও ৩৫ বৎসর কাল বাখরগঞ্জ জিলা ঢাকার অন্তর্গত ছিল। ইহার বহুকাল পরে ঢাকা ও বাখরগঞ্জের কতিপয় স্থল লইয়া ফরিদপুর জিলা গঠিত হয়। ফরিদপুর জিলা গঠনের পরেও মাদারীপুর মহকুমা কিছুদিন বরিশালের অন্তর্গত ছিল এবং গৌরনদী থানার বাগধা, বাকাল, ফুল্লশ্রী, গৈলা প্রভৃতি বহু গ্রামের দলীল মাদারীপুরে রেজিষ্টরী হইত। অদ্যাপি বরিশাল সদর রেজিষ্টরী আফিসের মহাফেজখানা হইতে উক্ত দলীল সমূহের নকল বাহির হইতেছে। †

বর্ত্তমান বরিশাল কালেক্টরীর ইদ্রাকপুর, রছুলপুর পরগণার খাজানা কতক ঢাকার কালেক্টরীতে, কতক ফরিদপুর কালেক্টরীতে এবং কতক বরিশাল কালেক্টরীতে দাখিল হয় এবং ইদিলপুর বীরমোহন ও কাশীমপুর সেলাপটি নামিক পরগণার খাজানা কতক ফরিদপুর ও কতক বরিশালে দাখিল হইয়া থাকে। সুতরাং, এতদ্দ্বারা স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে যে, বাখরগঞ্জ নাম সৃজনের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ফরিদপুর জিলার স্থানগুলি পুরাকালে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

"দিগ্বিজয় প্রকাশ বিবৃতি" গ্রন্থের সীমা বিষয়ক দ্বিতীয় বর্ণনামতে

† ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে মাদারীপুর মহকুমা বরিশাল হইতে উঠাইয়া ফরিদপুরের অন্তর্গত করা হইয়াছে এবং ফরিদপুরও ঐ সময় সৃষ্টি হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রমাণে ইতিপূর্ব্বে যে শ্লোকটী পাঠ করা হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে;—মেঘনা নদী পূর্ব্বভাগে। ঐ মেঘনা নদী ঢাকা, ত্রিপুরা হইয়া নোয়াখালীর বড় নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। সুতরাং মেঘনার কতকাংশ যে বর্ত্তমান নোয়াখালীর সীমার অন্তর্ভূত তাহা সুনিশ্চিত।

পশ্চিমে চ বলেশ্বরী।

বলেশ্বরী নদী যে বর্ত্তমান খুলনা জিলার অধিকাংশ স্থলে প্রবাহিত তাহা বোধহয় অনেকেই অবিদিত নহেন। যেহেতু, বলেশ্বরের তীরভূমি বনগ্রাম, মঘিয়া প্রভৃতি গ্রাম বর্ত্তমান খুলনা জিলার অন্তর্গত। বনগ্রাম ও মঘিয়ার কতিপয় জমিদার বাখরগঞ্জের সেলিমাবাদ পরগণার আংশিক মালিক। এই ছলিমাবাদ বা সেলিমাবাদ পরগণা যুক্তভাবে খুলনা ও বরিশাল জিলা ব্যপ্ত হইয়া রহিয়াছে। উক্ত সেলিমাবাদের সরকারী রাজস্ব কতক বরিশালে এবং কতক খুলনার কালেক্টরীতে দাখিল হইয়া থাকে। সুতরাং বলেশ্বরী প্রবাহিতা প্রদেশগুলি এবং চাক্‌সিরি পরগণা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত থাকায় পুরাকালে বর্ত্তমান খুলনার সমগ্র না হইলেও অধিকাংশ স্থান কি অন্ততঃ বাগেরহাট মহকুমা অবশ্যই চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইহা ব্যতীত আরও একটী ঘটনা এই যে খুলনা জিলার অধীন বাসুদেবপাড়া নামক গ্রামে গত সন পৌষ মাসে দনুদমর্দ্দন দেব নামে একটী রৌপ্য মুদ্রাও আবিষ্কার হইয়াছে, স্থানান্তরে তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হইল।

৬. ইন্দিলপুরী যক্ষ সীমা।

ইন্দিলপুরীকেই বর্ত্তমান ইদিলপুর বলে। প্রাচীন আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে দেখা যায়—জগদ্বিখ্যাত আকবর বাদসাহের প্রধান রাজস্ব সচিব মহাত্মা তোড়লমল ১৫৮২ খৃষ্টাব্দে যে রাজস্ব বিষয়ক বন্দোবস্ত করেন, তাহাতে

ইদিলপুরকেও বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া উল্লেখ করেন। সুতরাং ইদিলপুর যে পুরাকালে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, ইহা নিঃসন্দেহ এবং ইদিলপুর চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত থাকায় আধুনিক ফরিদপুরজিলার অধিকাংশই যে চন্দ্রদ্বীপ অধিকারভূক্ত ছিল, ইহা স্পষ্টই প্রমাণীকৃত হয়।

"দিগ্বিজয় প্রকাশ বিবৃতি' নামক সংস্কৃত গ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপের সীমা ৩০ যোজন বা ২৪০ মাইল উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমান বাখরগঞ্জের দৈর্ঘ্য উত্তর দক্ষিণে ৮৭ মাইল, এবং প্রস্থ পূর্ব্ব পশ্চিমে ৬০ মাইল মাত্র অবধারিত করা হইয়াছে, এবং ইহার পরিমাণ মাত্র ২৪৫৩৪৯৭ একর (এক একর ৩ বিঘা ½ কাঠা) ধার্য্য হইয়াছে। সুতরাং চন্দ্রদ্বীপের পরিধিগত ভূমি ৩০ যোজন পরিমাণ হইলে ইহা আধুনিক বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালী ও খুলনা জিলায় ব্যপ্ত ছিল, এরূপ না ধরিলে এ কথা সত্য হইতে পারে না। বরিশাল হইতে খুলনা ১০৪ মাইল এবং বরিশাল হইতে নোয়াখালী ৯০মাইল মোট পূর্ব্ব পশ্চিমে ১৯৪ মাইল, সুতরাং উক্ত ৩০ যোজন মধ্যে গিরি বর্জ্জিত প্রদেশ খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী সমন্বিত না হইলে কদাপি সম্ভব হয় না। ইহার পশ্চিমে জম্বুদ্বীপ, উত্তরভাগে স্ত্রীকার, মধ্যভাগে বাক্‌লা রাজধানী। এতদ্দ্বারাই প্রতীতি হইবে যে, মধ্যভাগে মাধবপাশা বা শ্রীনগর রাজধানী, উত্তরদিকে স্ত্রীকার (শীকারপুরের উগ্রতারা মহামায়ের মন্দির,) ‡ এবং পশ্চিমদিকে বলেশ্বর ও মধুমতির মধ্যে কোন দ্বীপাকার ভূমিকে জম্বুদ্বীপ বলা হইয়াছে।

অতএব উল্লিখিত প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপের সীমানা যে উত্তর কালে আধুনিক বরিশাল, নোয়াখালী, ফরিদপুর এবং খুলনা জিলায় পরিব্যপ্ত ছিল, তাহা সম্যক রূপেই প্রতিপন্ন হইল।

---

‡ শীকারপুরের নাসিকা পীঠের বিবরণ এই পুস্তকায় স্থানান্তরে দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

উৎপত্তি বিবরণ।

চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। "ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ড" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ বলেন—এখানকার সমস্ত ভূমি জলময় ছিল; মহাদেবের প্রসাদে ও তাঁহার ললাটস্থ অগ্ন্যুত্তাপে সেই জল শুষ্ক হয়। চন্দ্রচূড়ের মস্তকস্থ চন্দ্রকলার কিরণে এই দ্বীপ সিক্ত হইয়াছিল; এজন্য উহার নাম চন্দ্রদ্বীপ হইল। যথা—

চন্দ্রদ্বীপে পূরা বিপ্রাস্তোয় পূর্ণা চ ভূমিকা।
মহাদেব প্রসাদেন শুষ্কা ভূতাহি মৃত্তিকা॥
ললাটানল দাহেন বিলীনং হি জলং বহু।
স্থালী ভূতা চ পৃথিবী শৈবালাং সুখকারিকা॥
মহাদেবং মৃড়ানীচ পপৃচ্ছ সাদরান্বিতা।
পূর্ণচন্দ্রং বিহায়ৈবধার্য্যতে শশিনঃ কলা॥
কিং নিমিত্তং ত্বয়া ধার্য্যং কিং সুখং জায়তে ততঃ।

মহাদেব উবাচ—

অমাদি পৌর্ণমাস্যন্তাঃ যা এব শশিনঃ কলাঃ।
তিথয়স্তা সমাখ্যাতা ষোড়শৈব বরাননে॥
অমা ষোড়শভাগেন দেবী প্রোক্তা মহাকলাঃ।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। ক্ষণকাল আত্ম-সম্বরণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কেগা?" কন্যা উত্তর করিলেন—"আমি জেলের কন্যা, জাল ফেলা হইয়াছে, তাহার প্রহরীরূপে এখানে আছি।" চন্দ্রশেখর বলিলেন—"তুমি আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়া জলে ঝাঁপ দিতে নিষেধ করিলে কেন?" কন্যা উত্তর করিল—"তোমার উপাস্য দেবীর নামে ভাবী পত্নীর নাম হইয়াছে বলিয়া তুমি ক্ষোভে ও লজ্জায় আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে উদ্যত হইয়াছ; কিন্তু, উহা তোমার গুরুতর ভুল। স্ত্রীলোক মাত্রেই স্বয়ং কাত্যায়নীর অংশ; সুতরাং, তোমার উপাস্য দেবীর নামে ভাবী পত্নীর নাম হওয়ায় তোমার কোন পাপ বা অপরাধের কারণ হয় নাই। চন্দ্রশেখর বলিলেন—"আপনি সামান্যা মানবী বা জেলের কন্যা নহেন; আপনি আত্ম-গোপন করিতেছেন, প্রকৃত পরিচয় না দিলে আপনার সমক্ষে এই মুহূর্ত্তেই আমি এই অতল জলে ডুবিয়া মরিব।" এই কথার উপরে কন্যা আর আত্ম-গোপন করিলেন না। স্নেহ-ভরে বলিলেন—"বৎস চন্দ্রশেখর, আমিই তোমার সেই উপাস্য দেবী কাত্যায়নী। তুমি আমার আদেশানুসারে উক্ত কন্যাকেই বিবাহ কর; বরং আমার প্রতি তোমার ভক্তির ব্যাঘাত না হয়, তজ্জন্য উক্ত পাত্রীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া লও।

অদ্য হইতে সপ্তদশ দিবসে ইহার দক্ষিণদিকস্থ ভীষণ সুগন্ধা নদীর মোহনায় সমুদ্র মধ্যে একটী প্রকাণ্ড দ্বীপের ন্যায় চর পড়িবে, পরে তাহা মনুষ্যের বাসোপযোগী হইবে। তুমি তথায় গিয়া একটী রাজ্য স্থাপন কর; তোমার নামানুসারে উক্ত রাজ্যের নাম চন্দ্রদ্বীপ হইবে। যে স্থানে চর পড়িবে তাহার উত্তরাংশকে সুগন্ধা বলে; তুমি উহার উত্তরপাড়ে ডুব দিলে কাত্যায়নী ও মদনগোপাল মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইবে; ঐ মূর্ত্তিদ্বয় তোমার রাজধানীতে স্থাপন করিবে।"

চন্দ্রশেখর দেবীর আদেশে আত্মহত্যার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী আসিয়া তাবৎ বৃত্তান্ত মাতৃ দেবীর নিকট প্রকাশ করিলেন। তৎপর, ৭ম দিবসে যে বিবাহের দিন ছিল, তাহাতে উক্ত ভাবী পত্নীর নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ঐ নূতন নাম উল্লেখে বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন, এবং দেবীর আদেশানুযায়ী সপ্তদশ দিবসে সুগন্ধা নদীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া, প্রথম ডুবে কাত্যায়নী ও দ্বিতীয় ডুবে মদনগোপাল মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন। কেহ কেহ বলেন—তৃতীয় ডুব দিলে লক্ষ্মী মূর্ত্তি পাওয়া যাইত, এবং রাজ্যও চিরস্থায়ী হইত; কিন্তু, চন্দ্রশেখর আর ডুব দিলেন না। উক্ত মূর্ত্তিদ্বয় এবং আপন প্রিয় শিষ্য, সঙ্গীয় দনুজমর্দ্দনকে সহ দক্ষিণদিকে চলিলেন, এবং কতদূর অগ্রসর হইলে দেবীর কথিত দ্বীপ তাঁহাদের নেত্রগোচর হইল। তৎপর নিজ আবাস ভূমি বিক্রমপুর হইতে বহুতর লোক জন আনিয়া, নূতন রাজধানী স্থাপন করিলেন। দ্বীপের যে স্থানে রাজধানী স্থাপন করা হইল, সেই স্থানের নাম কচুয়া রাখা হইল। উহা বর্ত্তমানে পটুয়াখালী মহকুমার অন্তঃপাতী বাউফল থানার অধীন তেতুলিয়া নদীর পশ্চিমপাড়ে কালাইয়ার সন্নিকটে অবস্থিত আছে। এইরূপ কিম্বদন্তী যে, উক্ত দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে বৃহৎ কচুবন হইয়াছিল; তজ্জন্য সেই স্থানকে কচুয়া নামে অভিহিত করা হয়।

ঐতিহাসিক কিম্বদন্তীর সহিত ভৌগোলিক তথ্যের তুলনা।

ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন যে, হিমালয় বঙ্গোপসাগরের অংশ হ্রাস করিতেছে। এই কথা যে সম্পূর্ণ সত্য, তাহা ভূগর্ভস্থিত স্তর ও

তন্মধ্যস্থিত জল-জন্তুর অস্থি-পঞ্জর সাময়িকভাবে উহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। গত ১৩১৭ সনের মাঘ মাসে ঝালকাঠী ষ্টেসনাধীন হোসেনপুর গ্রামে লেখকের নূতন বাটীতে এক নাল জমির মধ্যে পুকুর খনন করিবার সময়ে সাত হাত মৃত্তিকার নীচে এক বিকট জল জন্তুর অস্থি-পঞ্জর এবং একখানি বড় নৌকার হালের অংশ পাওয়া গিয়াছিল। দুঃখের বিষয় লেখকের অজ্ঞাতসারে নোয়াখালী নিবাসী মুসলমান কুলিগণ উক্ত জল-জন্তুর অস্থি-পঞ্জরগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে; কিন্তু, হালের ভগ্ন অংশটুকু অদ্যাপি রহিয়াছে। এই জিলায় এই প্রকার শত শত স্থানে পুকুর ও পগার এবং নিম্নভূমি খননকালীন নৌকার তক্তা এবং কাছি পর্য্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় পাইবার বৃত্তান্ত জানা গিয়াছে।

প্রাকৃতিক শাস্ত্র বর্ণিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী অপরাপর দেশাপেক্ষা বঙ্গদেশে অধিকতর বিস্ময়-রসোদ্দীপক। বাকরগঞ্জে এই সমস্ত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী সমধিক লক্ষিত হয়। এ জিলার উত্তরদিক হইতে দক্ষিণদিক ক্রমশঃ ঢালু হইয়া চলিয়াছে। সমুদ্র হইতে উত্তরদিকে গড়ে প্রত্যেক মাইল ১০৮ ইঞ্চি উচ্চ। সুন্দরবনে চর বৃদ্ধি হইয়া এই জিলা ক্রমশঃ দক্ষিণে অগ্রসর হইতেছে। *

চন্দ্রশেখরের সহিত দেবীর কথোপকথন এবং চন্দ্রদ্বীপ স্থাপন বঙ্গাব্দ ৬০৬ সালে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং, ৭১৩ বৎসর পূর্ব্বে সমগ্র বরিশাল, ফরিদপুর এবং খুলনার দক্ষিণভাগ অতল জলধি-জলে নিমজ্জিত ছিল, ইহা

---

* চর যেরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আমরা শীঘ্রই পটুয়াখালী জিলা এবং কলাপাড়া বা আমতলী তাহার উপবিভাগে পরিণত হইয়াছে, ইহা দেখিতে পাইব।
লেখক।

অসম্ভব নহে। তৎকালে, এই জিলার শীকারপুর, ফুল্লশ্রী ও পোনাবালিয়া এবং ফরিদপুর ও ঢাকার মধ্যে কুশদ্বীপ ও শঙ্খকোট দ্বীপ নামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতিপয় দ্বীপ মাত্র অবস্থিত ছিল। ৮০০ শত বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর বিক্রমপুরের দক্ষিণ অংশেই যে গভীর গর্জ্জন করিয়া প্রবাহিত হইত, ইহা নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হয়;

এই জিলার ঝালকাঠী ও গৌরনদী ষ্টেসনের সীমানাস্থিত রৈভদ্রদী গ্রাম নিবাসী জনৈক ব্যক্তি ৺ কাশীধামে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর সহিত বহুকাল হয় দেখা করিয়াছিলেন। তাহাতে স্বামীজি তাঁহার নিবাস জিজ্ঞাসা করায় তিনি রৈভদ্রদী গ্রামের উল্লেখ করেন। তদুত্তরে স্বামীজি তাহা বুঝিতে না পারিয়া "শীকারপুরের কোন্ দিকে" জিজ্ঞাসা করেন। ভদ্রলোকটী যেই বলিলেন—"শীকারপুরের দক্ষিণে," অমনি স্বামীজি বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন—"ও সবও কি চর পড়িয়াছে?" উক্ত ভদ্রলোকের বাসগ্রাম রৈভদ্রদীও দ্বীপচর ছিল বলিয়াই সম্ভবতঃ শেষাক্ষর 'দী' হইয়াছে, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে করা যায় না; * এতদ্ভিন্ন এ জিলার চর সংযুক্ত বহু

---

* অনুমান ৪০ বৎসর পূর্ব্বে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর দেহান্তর হইয়াছে। যাহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাহারা বলেন স্বামীজির বয়স অনুমান ১৫০ বৎসর হইয়াছিল। তাহা হইলে সম্ভবতঃ একশত বৎসর কি তৎপূর্ব্বে তিনি শীকারপুরের নাসিকা পীঠ দর্শনার্থ আগমন করিয়াছিলেন, তখন বর্ত্তমান শীকারপুরের দক্ষিণাংশের নদী প্রবল আকারে পরিণত ছিল এবং তিনি শীকারপুরের দক্ষিণাংশের ভূভাগগুলি প্রকাণ্ড নদী বহুল স্থান মনে করিয়া থাকিবেন, নচেৎ শত বৎসরের বহুপূর্ব্বে রৈভদ্রদী এবং তাহার পূর্ব্বপার্শ্বের গুঠীয়া গ্রাম বহু লোকের আবাস ভূমি হইয়াছিল, কিন্তু শীকারপুরের নদীর অবস্থা বর্ত্তমান সময় অপেক্ষা তৎকালীন যে দশগুণ প্রস্থ ছিল ইহা নিশ্চিত। কারণ উক্ত শীকারপুরের নদীতে চর পড়িয়া চর সাধুহাটী, কয়মুল্লাকাঠী নামে একটী নূতন গ্রামের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার সীমানা নিতান্ত কম নহে।

গ্রামের নাম পাওয়া যায়। গৌরনদী ষ্টেসনাধীন চর সরিকল, চর জাহাপুর ইত্যাদি, ঝালকাঠীতে চর কেওতা, চর সাঙ্গর ইত্যাদি, কোতালীতে চর-কাউয়া, চর বদনা, চর করমজী, চর কর্ণকাঠী ইত্যাদি, নলছিটীতে চর নলছিটী ইত্যাদি, বাখরগঞ্জে চড়াদী বা চরামদ্দী ইত্যাদি, মেহেন্দীগঞ্জে চর-শ্যামরায়, চর খাগকাটা ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন ভোলা, পটুয়াখালী ও পিরোজ-পুরে চর সংযুক্ত গ্রামের অন্ত নাই। ইহাদ্বারা স্পষ্টতঃ অনুমিত হইবে যে, ৭০০ বৎসর পূর্ব্বে যে, এই প্রদেশ ভীষণ জলধিতলে নিমগ্ন ছিল, ইহা কিছু-মাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। তবে সর্ব্বাপেক্ষা শীকারপুর গ্রামটী অতীব প্রাচীন যেহেতু তথায় দেবীর ৫১ পীঠ পতিত হইয়া বহুকাল যাবৎ উগ্রতারার মূর্ত্তি স্থাপিত রহিয়াছে। এ জিলার ফুল্লশ্রী নিবাসী প্রাচীন কবি বিজয় গুপ্ত ১৪০৬ শকাব্দে অর্থাৎ ৫৩৮ বৎসর পূর্ব্বে পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। তখন তিনি লিখিয়াছেন—

পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে ঘণ্টেশ্বর,
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত নগর।

উক্ত প্রাচীন কবি ৺ বিজয় গুপ্তের লিখিত মতে দেখা যায়, পদ্মাপুরাণ রচনাকালীন ফুল্লশ্রী গ্রাম একটী দ্বীপে পরিণত ছিল। ফলতঃ ফুল্লশ্রী এবং শীকারপুর যে তৎকালীন উত্তাল তরঙ্গময়ী জলধীর মধ্যে দুইটী ক্ষুদ্র দ্বীপ ছিল, তদ্বিষয় সন্দেহ নাই। তবে ইহা নিশ্চিত যে উহার চতুর্দ্দিকস্থ নদীর অবস্থা বিল-উৎপত্তির পূর্ব্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঘণ্টেশ্বর নদী চড়া পড়িয়া মাত্র, সায়েস্তাবাদের উত্তরাংশে জাহাপুরের নদী বর্ত্তমান আছে। পশ্চিমে ঘাঘর বা ঘর্ঘরা নদীও খালে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণ কবিবর বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ কথিত, ঘাঘর নদীর উপর দিয়া পুরা প্রসিদ্ধ নবাব অনুচর

ছবি খাঁ এক প্রকাণ্ড জাঙ্গাল বান্ধিয়াছিল; বর্ত্তমানে ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড উক্ত জাঙ্গাল মেরামত করিয়া গৈলা হইতে আমবৌলার মধ্য দিয়া ঘাঘর পর্য্যন্ত রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছেন। এদিকেও ঘণ্টেশ্বরের নদীর মধ্য দিয়া জাহাপুরঘাট পর্য্যন্ত ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা প্রস্তুত হইয়াছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, দেবীর আদেশে এত বড় একটা প্রকাণ্ড চর পড়িয়া তাহা একটা বিশাল রাজ্যে পরিণত হইল, ইহা সম্ভবপর নহে। উহা প্রকৃতই কাল্পনিক ও কিম্বদন্তী; কিন্তু, এই জিলার ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে ইহা কিছুতেই অসম্ভব বলিয়া বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ১০০ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ইল্‌সা বা তেতুলিয়া, মাসকাটা, কালাবদর, মুলাদী ও জাহাপুরের নদী এবং পিরোজপুরের কালীগঙ্গা, কচা ও কোটালীপাড়ার ঘাঘর নদী যে একমাত্র সুগন্ধা নামেই প্রকাণ্ড নদীর মধ্যে ছিল, তাহা সুনিশ্চিত। ভীষণ সুগন্ধা নদী মধ্যে ফুল্লশ্রী, শীকারপুর এবং পোনাবালিয়া বহুকাল পূর্ব্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপাকারে অবস্থিত ছিল। কালক্রমে সমস্ত চর জাগিয়া এ জিলার সদর বিভাগের সৃষ্টি করিয়াছে। জাহাপুরের চর এত নূতন যে, ১২১৯ সনে মাত্র উহা বন্দোবস্তের উপযুক্ত নির্দ্ধারিত হইয়া বন্দোবস্ত হয়। সুগন্ধার পশ্চিমেদিকের ব্রাহ্মণদিগকে এখনও সোন্ধারকুলী বলে, এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিত নিমন্ত্রণ সময় বাক্‌লা, বাঙ্গরোরা ও সোন্ধারকুলী নামে অদ্যাপি অভিহিত করিয়া থাকে। অতএব চন্দ্রদ্বীপের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী এবং দেবীর আদেশ প্রভৃতি কথাগুলি আছে, তাহা যে সম্পূর্ণ কাল্পনিক নহে, তাহা ভৌগোলিক তথ্যদ্বারাও প্রতিপন্ন হইল।

চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস।

তৃতীয় অধ্যায়।

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের কচুয়ায় অবস্থিতি।

প্রথম (আদি) রাজা দনুজমর্দ্দন দে,

বঙ্গাব্দ ৬০৬ সাল. ইং ১১৯৯ খৃষ্টাব্দ।

দেবীর আদেশে চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য কচুয়ায় গিয়া রাজধানী স্থাপন করিলেন ; কিন্তু, সংসারাশ্রম তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি বঙ্গাব্দ ৬০৬ সালে তাঁহার শিষ্য দনুজমর্দ্দনকে চন্দ্রদ্বীপের অধীপতি করিয়া হিমালয় প্রদেশে চলিয়া যান। দনুজমর্দ্দনই চন্দ্রদ্বীপের আদি কায়স্থ রাজা। দনুজমর্দ্দন দেব চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারীর এক প্রিয় শিষ্য ছিলেন ; তাঁহার আদিম বাসস্থান গৌড়ে ছিল। ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি আপন ইষ্টদেব চন্দ্রশেখরের আহ্বানে বিক্রমপুরে উপনীত হন এবং তথাহইতে ঋষিকল্প চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারী সহ বর্ত্তমান বরিশাল জিলার দক্ষিণ প্রান্তে সমুদ্র উপকূলে নবোত্থিত দ্বীপে রাজধানী স্থাপন করেন। ইঁহার রমাবল্লভ নামে বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায় এক পুত্র হয় ; এই পুত্র অচিরে ক্ষমতাপন্ন হইয়া, :বর্ত্তমান বরিশাল, খুলনা, ফরিদপুর জিলাব্যাপক জনপদগুলিতে নিজ রাজ্য বিস্তার করেন। দনুজমর্দ্দন দেব রাজত্বের শেষভাগে বহুদূর রাজ্য বিস্তৃতি হয় এবং দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী স্বাধীন রাজা সাধারণ্যে জ্ঞাপন জন্য, নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। গত বৎসর পৌষ মাসে বড় দিনের বন্ধের সময় খ্যাতনামা

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের কচুয়ায় অবস্থিতি।

বিজ্ঞানাচার্য্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র নামক জনৈক ভদ্রলোক এবং উক্ত রায় মহাশয়ের ভ্রাতা রায় সাহেব নলিনীকান্ত রায় চৌধুরী মহাশয় সুন্দরবনে পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে অনেক লোকজন সঙ্গে নিয়া বহির্গত হন। তাঁহারা প্রথমতঃ চাঁদখালী দর্শন করিয়া কাল্‌কীর খাল ও চেউটী নদী দিয়া খোলপাটুয়ার নদীতে পড়িয়া গত ১৯১১ সনের ২৬শে ডিসেম্বর বিছট্ গ্রামে পৌছেন। উক্ত বিছট্ গ্রামে তাঁহারা একটী পোতাশ্রয় বা প্রকাণ্ড ডক্ দেখিতে পান। ঐ স্থানে যে পুরাকালে জাহাজ, শুলুক প্রস্তুত হইত, তদ্বিষয় কোন সন্দেহ নাই, এতদ্ভিন্ন তথায় আরও অনেক কীর্ত্তি-চিহ্ন বিদ্যমান আছে। ঐ স্থান ও ঐ স্থানের নিকটবর্ত্তী বাসুদেবপুর গ্রামটী বর্ত্তমান খুলনা জিলার অন্তর্গত। উক্ত বাসুদেবপুর গ্রামে একটী মুসলমান কবর খননকালীন একটী প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। ঐ মুদ্রাটী উক্ত বাসুদেবপুর গ্রাম নিবাসী জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় নামক জনৈক ভদ্রলোকের হস্তগত হয়। তিনি উহা পাইয়া দৌলতপুর আসিয়া মুদ্রাটী পরিষ্কার করিয়া উহার পাঠোদ্ধার করেন। উহার এক পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীদনুজমর্দ্দন দে এবং অপর পৃষ্ঠে শ্রীশ্রীচণ্ডীচরণ পরায়ণ সম্বৎ ১৩৩৯ এবং উহার চতুষ্কোণে **চ ন্দ্র দ্বী প** লিখা আছে। উহার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের বিশিষ্ট কর্ম্মাধ্যক্ষ মুদ্রাতত্ত্ববিৎ সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ মহাশয় অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন।

এ দিকে বঙ্গাব্দ ৬০৬ সালের সহিত উক্ত মুদ্রার লিখিত সম্বৎ ১৩৩৯ তুলনা করিলে বর্ত্তমান সম্বৎ ১৯৭০ হইতে ১৩৩৯ বাদ দিলে ৬৩১ বৎসর হয় এবং বর্ত্তমান বঙ্গাব্দ ১৩১৯ হইতে ৬০৬ বাদ দিলে দনুজমর্দ্দন যে স্বীয় রাজত্বের ৭২ বৎসরের সময় নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহার

অকাট্য প্রমাণ হয়। বিশেষতঃ তৎকালে লোকের যেরূপ আয়ু ছিল, তাহাতে তিনি ৩০ বৎসর বয়ঃক্রমে কচুয়ায় আগমন করিলেও ১১২ বৎসর তাঁহার আয়ুষ্কাল ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে, ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে করারও কোন কারণ দেখা যায় না। যেহেতু ১১২ বৎসর বয়স্ক জীবমান বৃদ্ধের অনুসন্ধান করিলে প্রতি জিলায় ৭।৮টি লোকের সন্ধান মিলিতে পারে। ‡

(২য় রাজা) রমাবল্লভ।

রমাবল্লভ রায়ের সময়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। রমাবল্লভের পুত্র (৩য়) কৃষ্ণবল্লভ এবং তৎপুত্র (৪র্থ) হরিবল্লভ এবং হরিবল্লভের পুত্র (৫ম) জয়দেব বা জগৎবল্লভ রায়। উক্ত জগৎবল্লভ রায়ের পুত্র সন্তান ছিল না। তাঁহার অন্য কোন উত্তরাধিকারী না থাকায়, তাঁহার দৌহিত্র এই জিলার দেহেরগতি নিবাসী বসুবংশীয় বলভদ্র বসুর পুত্র পরমানন্দ রায় চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

(৬ষ্ঠ রাজা) পরমানন্দ রায়।

বঙ্গদেশীয় প্রাচীন হিন্দু নরপতি মাধব বা কেশব সেন নামধারী রাজা আদিশূর পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিবার নিমিত্ত ৯৯৯ শকাব্দীতে কাণ্যকুব্জ হইতে যে পাঁচজন বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তৎসঙ্গে পাঁচজন কায়স্থও আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম (১) মকরন্দ ঘোষ, (২) দশরথ বা পুষণ

‡ মুদ্রা প্রাপ্তির বিবরণটী ১৩১৯, আষাঢ় মাসের প্রবাসী হইতে সঙ্কলিত।

বসু, (৩) বিরাট গুহ, (৪) কালিদাস অথবা তারাপতি মিত্র, (৫) পুরুষোত্তম দত্ত। উল্লিখিত পাঁচজন ব্রাহ্মণ যেমন তাঁহাদের স্ত্রী-পুত্রাদি আনাইয়া এতদ্দেশে বসবাস করেন; উক্ত পাঁচজন কায়স্থও তদ্রূপ তাঁহাদের স্ব স্ব স্ত্রী, সন্তান সন্ততিদিগকে কাণ্যকুব্জ হইতে আনাইয়া এতদ্দেশে বসবাস করিতে থাকেন। বঙ্গদেশে উক্ত কায়স্থ জাতির মান সম্ভ্রম চন্দ্রদ্বীপ রাজার চেষ্টায় যেরূপ উন্নত হইয়াছিল, বঙ্গের অন্যত্র কোথাও তদ্রূপ দৃষ্ট হয় না। বঙ্গদেশের মধ্যে অদ্যাপি চন্দ্রদ্বীপ সমাজের কায়স্থগণ অপরাপর স্থানের কায়স্থগণ অপেক্ষা শীর্ষ স্থানীয়। রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় উক্ত আদি পুষণ বসু হইতে অধস্তন ত্রয়োদশ পুরুষ; যথা—

(১) পুষণ বা দশরথ বসু, (২) দিবাকর বসু, (৩) বাভট বসু, (৪) তমারবহু বসু, (৫) পুরু বসু, (৬) ভাই বসু, (৭) থাক বসু, (৮) কন্দর্প বসু, (৯) মার্কণ্ড বসু, (১০) উষাপতি বসু, (১১) বলভদ্র বসু, (১২) পরমানন্দ বসু বা রাজা পরমানন্দ রায়।

রাজা পরমানন্দ রায় কুলীন কায়স্থগণের বিষয় অনেক নিয়ম করেন। কায়স্থগণের গণনাস্থলে পূর্ব্বে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এই ক্রমানুসারে গণনা হইত। ইঁহার সময় হইতে বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র এই ক্রমানুসারে গণনা আরম্ভ হয়। রাজা পরমানন্দ রায়ের মূল পূর্ব্বপুরুষ দেহেরগতির বসুবংশ। উক্ত দেহেরগতির বসুবংশ দেহেরগতি ও রামচন্দ্রপুর বাস করিতেছেন। উক্ত বসুবংশসম্ভূত ব্যক্তিগণ অদ্যাপি নামের সহিত "নারায়ণ" শব্দ যোগ করিয়া থাকেন। দেহেরগতি নিবাসী শ্রীযুক্ত গিরিশনারায়ণ বসু এবং রামচন্দ্রপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত নবীননারায়ণ বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের বংশের নাম করিয়া স্বীয় বংশে গৌরবান্বিত আছেন। রাজা

পরমানন্দ রায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে,—উক্ত রাজা শক্তি পূজায় একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন, তিনি গঙ্গার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, যেন অন্তকালে তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হন। একদা তেতুলিয়া নদীর জল উচ্ছ্বাসিত হইয়া, রাজবাটীর গৃহ পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছিল। রাজা এই বিস্ময়কর ব্যাপার অবলোকন করিয়া, স্মরণ করিলেন বুঝি গঙ্গা তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আগমন করিয়াছেন। তখন কৃতাঞ্জলিপুটে গঙ্গার প্রতি নিবেদন করিলেন, মা! যদি আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়া থাকে, তবে আমাকে গ্রহণ করুন। তাহাতে গঙ্গাদেবী আবির্ভূতা হইয়া হস্ত প্রসারণ করিলে রাজা পরমানন্দ দেবীর হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। মূহুর্ত্ত মধ্যে তিনি অন্তর্হিত হইলেন এবং নদীর জলও যথাস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

(৭ম রাজা) জগদানন্দ রায়।

রাজা পরমানন্দের নদীস্রোতে জীবন বিসর্জ্জনের পর তৎপুত্র জগদানন্দ রায় চন্দ্রদ্বীপের রাজা হন। তাঁহার কন্দর্পনারায়ণ রায় নামে এক পুত্র ও কমলা নাম্নী এক কন্যা থাকে। রাজকুমারী কমলা লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া বাউফল ষ্টেসনাধীন কচুয়া ও কালাইয়ার মধ্যস্থানে এক প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেন। অদ্যাপি উহা কমলার দীঘি বলিয়া বিখ্যাত আছে। বর্ত্তমান সময় উক্ত দীঘির অধিকাংশ স্থান ভরাট হইয়া গিয়াছে এবং দীঘির চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

(৮ম রাজা) কন্দর্পনারায়ণ রায়।

১৫৮২ খৃষ্টাব্দ, বঙ্গাব্দ ৯৮৯ সাল।

রাজা জগদানন্দ ইহলোক ত্যাগ করিলে, তৎপুত্র মহাবল পরাক্রান্ত কন্দর্পনারায়ণ রায় চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার আমলে

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের কচুয়ায় অবস্থিতি।

চন্দ্রদ্বীপের বিস্তৃতি পশ্চিমে যশোহর জিলা ও উত্তরে ঢাকা জিলা পর্য্যন্ত বিস্তৃতি হয়। ইঁনি বসুবংশের তৃতীয় রাজা; ইঁনি তৎকালীন সমগ্র বঙ্গ-দেশের কায়স্থ সমাজের অগ্রণী ছিলেন। তাঁহার সমাজের প্রতিপত্তি দেখিয়া এবং তাঁহার অধিকারস্থ চাক্‌সিরি পরগণা প্রাপ্তির আশায় তৎকালীন যশোহরের প্রতাপশালী মহারাজ প্রতাপাদিত্য স্বীয় দুহিতা বিন্দুমতীকে কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্রের নিকট দেওয়ার জন্য চন্দ্রদ্বীপ রাজধানীতে ঘটক প্রেরণ করেন। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফন্সিকা (Foncica) নামক জনৈক পাদরী চন্দ্রদ্বীপ রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তের ডায়েরীতে পাওয়া যায় যে, তৎকালীন যুবরাজ রামচন্দ্রের বয়স মাত্র ৮ বৎসর, তখন মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ৬ষ্ঠ বর্ষীয়া কন্যার সহিত তাঁহার সম্বন্ধের প্রস্তাব চলিতেছিল। উহার কিছুদিন পরেই যুবরাজ রামচন্দ্রের বিবাহ হয়।

কন্দর্পনারায়ণ রায়ের সময় (১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে) ভীষণ বন্যা হয়, তাহাতে রাজধানীর বিস্তর ক্ষতি হয় এবং অনেক লোক জনের মৃত্যু হয়, রাজ-পরিবার বহুকষ্টে জীবন রক্ষা করেন। কতক লোক মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া প্রাণ রক্ষা করেন এবং উক্ত বন্যা উপলক্ষে তৎকালীন প্রায় ২ লক্ষ প্রাণী বিনষ্ট হয়। বহুকাল হয় কচুয়া রাজধানী সীমানাস্থিত অনেক স্থান বিলে পরিণত হইয়াছে, তাহা বর্ত্তমানে কালারাজা ও ধলারাজার বিল নামে প্রসিদ্ধ। উক্ত বিলের মধ্যে প্রাচীন ভগ্ন অট্টালিকা ও ভগ্নাবশেষগুলি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। উক্ত স্থানগুলি এক্ষণ বৃহদাকার সর্প প্রভৃতির আবাসভূমি হইয়া রহিয়াছে।

দুর্গ নির্ম্মাণ।

রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় সমুদ্র উপকূল হইতে স্বরাজ্য আক্রমণ আশঙ্কায় বঙ্গোপসাগরের লগ্ন রাবণাবাদ নদীর সঙ্গমে একটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

কচুয়া রাজধানী পরিত্যাগ ও রাজনগর গমন এবং বিশারীকাঠীতে রাজধানী স্থাপন।

পটুয়াখালী মহকুমাধীন প্রতাপপুরের নিকট রাজনগর নামক স্থানে রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় রাজধানী করার ইচ্ছুক হইয়া তথায় কয়েকটী দীঘি খনন এবং গড় নির্ম্মাণ করেন ; কিন্তু অবশেষে তথায় রাজধানী করার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া ইহার পূর্ব্বোত্তরে রাজধানীর স্থান অন্বেষণ করেন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা বিন্দুমতীর সহিত যুবরাজ রামচন্দ্রের বিবাহ হইলে পর উক্ত যশোহরের লোকের ইঙ্গিতে এবং অন্যান্য অসুবিধায় রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় রাজধানী পরিত্যাগ করার সঙ্কল্প করেন এবং তদনুসারে কচুয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া রাজনগর গমন করেন এবং তৎপর তাহার প্রায় দেড় প্রহর ব্যবধান উত্তর পূর্ব্বদিকে কাকরধা ও ভাতশালার নিকট বিশারীকাঠীতে রাজধানী স্থাপন করেন। রাজার পারিষদবর্গও রাজার সঙ্গে সঙ্গে তথাহইতে আসিয়া বিশারীকাঠীর নিকটবর্ত্তী ভাতশালা ও কাকরধা এবং কোশাবর গ্রামে বস-বাস করিতে আরম্ভ করেন। এজন্য অদ্যাপি ভাতশালা ও কাকরধা কুলীন কায়স্থগণের আবাসভূমি হইয়া রহিয়াছে। উক্ত বিশারীকাঠীতে অদ্যাপি রাজবাটীর চিহ্ন ভগ্ন ইষ্টকালয়াদি বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাহা ভূমিকম্প কি ভূগর্ভের

অন্য কোন পার্থিব কারণে মৃত্তিকাগর্ভে অধিকাংশ দালানকোঠাগুলি বসিয়া গিয়াছে; এক্ষণ তন্মধ্যে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র-জন্তু বিচরণ করিয়া থাকে। কথিত আছে, বিশারীকাঠীর নিকট রাজার প্রকাণ্ড ৬৪ দাড়ের কোশ নৌকার ঘাট ছিল বলিয়া ঐ গ্রাম কোশাবর নামে প্রসিদ্ধ আছে।

কচুয়া রাজধানী পরিত্যাগের কারণ।

বর্ত্তমান সময় সুন্দরবনের দক্ষিণাংশে অনুসন্ধান করিলে স্থানে স্থানে অনেক জঙ্গলাবৃত ইষ্টকালয়মণ্ডিত প্রাচীন বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। ঐ সকল স্থানে প্রাচীনকালে যে বহুলোকের বসতি এবং বিস্তৃত জনপদ ছিল, তদ্বিষয় কোন সন্দেহ নাই। যখন চন্দ্রদ্বীপের রাজা কচুয়া নগরীতে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতেছিলেন। তৎকালীন বর্ত্তমান পটুয়াখালী মহকুমাস্থিত গলাচিপা, গুলিসাখালী, মৃজাগঞ্জ, আমতলী, বরগুনা প্রভৃতির সন্নিহিত স্থানসমূহ এবং পিরোজপুরের অধীনস্থ সুন্দরবনের অধিকাংশ স্থানেই বৃহৎ জনপদ ছিল, তৎকালে মহারাষ্ট্রীয়েরা যেমন মধ্যে মধ্যে উত্তর বঙ্গে আসিয়া অত্যাচার করিত এবং সেই অত্যাচারকে লোকে বর্গীর হাঙ্গামা বলিত * তদ্রূপ আরকান এবং পূর্ব্বাঞ্চলস্থ মগ প্রভৃতি জল-দস্যুর অত্যাচার ও উৎপীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া, সম্ভবতঃ প্রোক্ত সুন্দরবনের অধিবাসিগণও ঐ সকল স্থান ত্যাগ করিয়া ক্রমিক উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। পুরাকালে যখন বঙ্গোপসাগর বর্ত্তমান ঢাকা জিলার বিক্রম-

---

* এক্ষণও ছেলে মেয়েদিগকে এতদঞ্চলে ঘুম পাড়ার সময় একটী ছড়া বলিয়া থাকে,

খোকা ঘুমাইল পাড়া জুড়াইল বরগী আইল দেশে
বুল্ বুলীতে ধান খাইল খাজানা দিমু কিসে ?
ঘুম আয় লো আয়।"

পুরের নিকটবর্ত্তী ছিল, তৎকালে চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্যের স্বপ্নাদিষ্ট একটী প্রকাণ্ড দ্বীপ (চর) সৃষ্টি হওয়া বিক্রমপুরের দক্ষিণাংশ ও চন্দ্রদ্বীপের উত্তরাংশের নদীতে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক চর ও অবশিষ্ট অংশগুলি বিলের বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের সৃষ্টি করিতেছিল। সদর এলেকায় প্রত্যেক থানায় এক্ষণও কিছু কিছু বিল বর্ত্তমান আছে। গৌরনদী ষ্টেসনে আস্কর, জল্লা, সোমাইরপাড়, কালবিলা, কুড়লিয়া, বিশারকান্দী, হারতা প্রভৃতি বিলগুলি উক্ত প্রমাণের সমর্থন করিতেছে ; সুতরাং, চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য স্থাপন হইলে বিক্রমপুর হইতে চন্দ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত স্থানগুলিতে মাঝে মাঝে লোকের বাসোপযোগী হইয়াছিল। ঐ উত্তরদিক যখন ক্রমশঃ বাসোপযোগী হইতে লাগিল ; তখন দক্ষিণে সুন্দরবন অঞ্চলের লোকগণ মগ প্রভৃতির অত্যাচার হইতে অসুবিধা নিবারণের জন্য ক্রমশঃ উত্তরদিকে আসিতে লাগিলেন। বিশেষ তৎকালীন মগজাতি এত ঘৃণার্হ ছিল যে, কোন হিন্দুর বাড়ীর উপর দিয়া মগ হাটিয়া গেলে তাহার জাতি যাইত। রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণের কুলীন সম্প্রদায় মধ্যে দেবীবর যে মেলবন্ধন করেন, তন্মধ্যে চন্দ্রশেখরী মেল এই মগ বাদে হইয়াছিল, অর্থাৎ বাড়ীর উপর দিয়া মগ হাটিয়া যাওয়ায় তাহার জাতিপাত হয় বলিয়া তৎকালে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। + ব্রহ্মখণ্ড নামিক সংস্কৃত গ্রন্থে উল্লেখ আছে—মগদিগের উৎপীড়নে বিস্তৃত জনপদের দক্ষিণাংশ উৎসন্ন হয়। এ জিলার গাভা গ্রামের প্রসিদ্ধ কুলীন কায়স্থগণও কতকাংশ দক্ষিণদেশ ভাতশালা, কাকরধা হইতে ক্রমশঃ গাভা, বানরিপাড়া প্রভৃতি গ্রামে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন।

\+ "মগ যোগী ভুলাই দিজে চন্দ্রশেখর মজে।
তাই কেশরী অঙ্গের কুলে ধর্ম্ম বিয়াজে।" মেলমালা।

ক্ষুদ্রকাঠীতে অবস্থান।

রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় বিশারীকাঠী রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, বর্ত্তমান বরিশালের পশ্চিম-উত্তর কোণে ক্ষুদ্রকাঠীতে আসিয়া রাজধানী স্থাপন মানসে তথায় এক দীঘি খনন করেন। পক্ষান্তরে ঐস্থানে রাজধানী স্থাপন না করিয়া অন্যত্র ভাল স্থান পাওয়া যায় কি না, তজ্জন্য দক্ষিণদিকে অনুসন্ধান করেন এবং পঞ্চনদের সঙ্গমস্থলের পশ্চিমপাড়ে হোসেনপুর গ্রাম মনঃপূত হওয়ায় তথায় রাজধানী স্থাপন করাই সুস্থির করেন। তৎকালীন হোসেনপুর একজন বলবান্ সরদারের অধীনে বহু মুসলমান সমাকীর্ণ জনপদ ছিল। রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় উক্ত মুসলমান সরদারকে তাহার অনুচরগণসহ হোসেনপুর ত্যাগ করিতে বলেন; কিন্তু সরদারও তেমন সহজ লোক ছিলেন না, তাহার যথেষ্ট লোকবল ও কিছু যুদ্ধোপকরণ ছিল; তজ্জন্য সরদার দম্ভের সহিত রাজার আদেশ প্রত্যাহার করিলেন; সুতরাং যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। রাজা কন্দর্পনারায়ণ সরদারকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন এবং হোসেনপুরের উত্তরাংশে বর্ত্তমান কথিত ডহরপাড়া নামক স্থানে উভয় পক্ষে তুমুল সংগ্রাম হইল। উক্ত সংগ্রামে রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের অমিততেজে মুসলমান সরদার সদল বলে নিহত হইলেন; অবশিষ্ট মুসলমানগণ ভীত ও ত্রাসিত হইয়া হোসেনপুর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিলেন। হোসেনপুরের উত্তর পূর্ব্বে দুই মাইল পরিমাণ স্থান মুসলমান শূন্য হইল। রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় স্বয়ং সেই যুদ্ধে আহত হন এবং ক্ষুদ্রকাঠী পৌছিয়াই দেহত্যাগ করেন এই ক্ষুদ্রকাঠীতেই কন্দর্পনারায়ণ রায়ের দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল।

(৯ম রাজা) রামচন্দ্র রায়।

(হোসেনপুরে রাজধানী স্থাপন ও অবস্থিতি)।

বঙ্গাব্দ ১০০৫. খৃষ্টাব্দ ১৫৯৮।

কবিবর বিজয় গুপ্ত তাঁহার রচিত পদ্মাপুরাণে উল্লেখ করিয়াছেন—

ঋতুশূন্য বেদশশী পরিমিত শক।

সুলতান হোসেনসাহ নৃপতি তিলক।

উক্ত শ্লোকানুসারে ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশে তৎকালীন হোসেনসাহ রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি খুব প্রজারঞ্জক নরপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ তাহার নামানুসারেই হোসেনপুর নাম হইয়া থাকিবে। হোসেনসাহ এবং তাঁহার পুত্র নসির সাহকে তৎকালীন হিন্দুরা কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, নিম্নলিখিত বৈষ্ণবপদাবলী পড়িলে তাহা বুঝা যাইবে। পদাবলীটি এই—

"সে যে নসিরা সাহজানে
যারে হানিল মদন বাণে,
চিরঞ্জীব রহ পঞ্চ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভণে।"

দেশস্থ প্রধান নরপতি বিধর্ম্মী এবং ভিন্ন জাতি হইয়াও প্রজারঞ্জক হইলে হিন্দুরা তাঁহাকে চিরদিন ভক্তি করিয়া আসিয়াছেন, এবং তদ্রূপ অদ্যাপি ভক্তি করিয়া থাকেন। সুতরাং তৎসাময়িক প্রধান নরপতি হোসেনসাহের নামানুসারে হোসেনপুর গ্রামের নাম হওয়া বিচিত্র নহে। * ক্ষুদ্রকাঠীতে

* যখন বর্ত্তমানে এ জিলায় রমানাথপুর, গোবিন্দপুর, সায়েস্তাবাদ, ছলিমাবাদ, সুজাবাদ, রমজানকাঠী, রহমতপুর, আওরঙ্গাবাদ, চরবুলার, চরহার্ডিঞ্জ, ওয়েষ্টনগঞ্জ, লাল-

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের হোসেনপুরে অবস্থিতি।

হঠাৎ রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের মৃত্যু হওয়ায় রাজা রামচন্দ্র রায় তথায় রাজধানী স্থাপনের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, হোসেনপুর গ্রামে উপনীত হন। পরে পঞ্চমুখী নদের সঙ্গমস্থলের পশ্চিমপাড়ে একটী দীঘি খনন করেন এবং তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমপাড়ে দুইখানি প্রকাণ্ড ইষ্টক-নির্ম্মিত ঘাট দিয়া দেন এবং উক্ত দীঘির পূর্ব্বপাড়ে একটী কালীর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। উক্ত মন্দিরের ইষ্টকগুলি ও উহার চুণকাম দেখিলে উহা যে অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমিত হয়। চুণকামগুলি স্থানে স্থানে এক্ষণও অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। উক্ত দীঘিকা এবং উহার পাড়ের কালীর মন্দিরাদি এ যাবৎ গভীর অরণ্যে পরিণত হইয়া ব্যাঘ্রাদির আবাসভূমি ছিল; সম্প্রতি স্থানীয় আলীমদ্দীন নামক জনৈক মুসলমানের চেষ্টায় উহার কতকাংশ আবাদ হইয়াছে। ঐ স্থানে পাঁচটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী একত্র মিলিত ছিল বলিয়াই ঐ স্থানকে পঞ্চকরণ বলিত। প্রকৃত প্রস্তাবে পঞ্চকরণ হোসেনপুর গ্রামের পূর্ব্ব প্রান্তভাগ। রাজা রামচন্দ্র রায় পঞ্চকরণ হইতে পশ্চিমদিকে প্রায় অর্দ্ধমাইল ব্যবধানে রাজবাড়ী প্রস্তুত জন্য চতুর্দ্দিকে পরিখা (গড়) প্রস্তুত করিয়া তথায় রাজধানী সংস্থাপিত করেন। বর্ত্তমানে উক্ত রাজবাড়ীর উত্তরদিকে গোবিন্দ শঙ্খবণিকের বাড়ী, দক্ষিণে রামদয়াল নট্টের বাড়ী, পশ্চিমদিকে শ্রীকান্ত খানসামা ও রতিরাম খাসখালের বাড়ী এবং পূর্ব্বদিকে প্রকাণ্ড মাঠ অবস্থিত। রাজবাড়ী হইতে এক প্রকাণ্ডজাঙ্গাল পঞ্চকরণ কালীর মন্দির পর্য্যন্ত গিয়াছে। উক্ত জাঙ্গালটী স্থানে স্থানে উচ্চ ও জঙ্গলাকীর্ণ থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজবাড়ীর

মোহন, কৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রামের নাম দৃষ্ট হয়। তখন হোসেনসাহ নৃপতির নাম অনুসারে হোসেনপুর গ্রামের নাম সৃজন হওয়া সম্ভবপর বলিয়া মনে করা দূষণীয় নহে।

তিনদিকেই তৎকালে নদী ছিল, উত্তরদিকের সীমা নির্দ্ধারণ জন্য রাজা, শ্রীবল্লভ নামক জনৈক কর্ম্মচারীর দ্বারা পূর্ব্ব পশ্চিমরোক এক বেড় খনন করেন। উক্ত বেড়ের লগ্ন উত্তরপার্শ্বের গ্রামকে তজ্জন্য বেড়কাটি বলিয়া থাকে, বর্ত্তমানে উহার অপভ্রংশে বৈড়কাঠীও বলিয়া থাকে এবং সাধারণতঃ উক্ত বেড় "বল্লভের খাল" বলিয়া অদ্যাপি প্রসিদ্ধ আছে। ‡

হোসেনপুরের মুসলমান অধিবাসিগণকে বিতাড়িত করিয়া, রাজা রামচন্দ্র রায় রাজধানীর চতুর্দ্দিকে নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর কায়স্থ, শঙ্খবণিক, গন্ধবণিক, মালাকর, কুম্ভকার, রাজ, পাটনী, কাহার, তৈলিক, কর্ম্মকার প্রভৃতি জাতির বসতি করান। রাজার স্থাপিত ব্রাহ্মণাদি জাতির যে সকল লোক বর্ত্তমানে বাস করিতেছেন,তাহাদের একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

(১) ব্রাহ্মণ।

(ক) কুলীন — রাজার স্থাপিত বন্দ্যঘটী বংশীয় সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায় ও বেচারাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব্বপুরুষ এবং লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন, গাঙ্গুলী বংশে রজনীনাথ গাঙ্গুলীর পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন। বন্দ্যবংশে সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র শশিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় শোলক গ্রামে গিয়া বাস করিতেছেন। উক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যালঙ্কার উপাধিবিশিষ্টনবদ্বীপ প্রত্যাগত স্মৃতিশাস্ত্রের পণ্ডিত ছিলেন; ইহার বিদ্যাবত্তা দেখিয়া রাজা ইঁহাকে কতক ভূমি ব্রহ্মত্র দেন এবং তাঁহাকে দ্বার পণ্ডিত মনোনীত করেন। ইঁহার বংশধর গৌরচন্দ্র শিরোমণিও নবদ্বীপ প্রত্যাগত

‡ বেড় শব্দটী বেষ্টন শব্দেও প্রয়োগ করা যাইতে পারে।

স্বনাম প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমানে তঁহার একমাত্র বৃদ্ধ পুত্র বিদ্যমান আছে।

(খ) বংশজ—হবিষ্মশীবংশে কালীকিঙ্কর ন্যায়বাচস্পতি নবদ্বীপ প্রত্যাগত নৈয়ায়িক পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারও অসাধারণ নাম ও প্রতিপত্তি ছিল এবং ইঁনি রাজার প্রধান দ্বার পণ্ডিত ছিলেন। ইঁনি এবং এই বাটীস্থ স্বর্গীয় হরিরাম তর্কভূষণ প্রভৃতি বহুতর পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়া হোসেনপুর উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। ইঁহাদের এক প্রকাণ্ড চতুষ্পাঠী ছিল, বহুদেশ ও দিগ্দিগন্তর হইতে ছাত্রগণ আসিয়া উহাতে অধ্যপণা করিত। এ জিলায় ইঁহাদের বিস্তর মন্ত্রশিষ্য এক্ষণও বিদ্যমান আছে। বর্ত্তমানে কালস্রোতে ইঁহারা শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছেন; শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ ক্রমিক এক একটী করিয়া কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন; বর্ত্তমানে এই বংশে একটী প্রৌঢ় ও কতিপয় যুবক বিদ্যমান আছে।

(গ) শ্রোত্রীয়—রাজা রামচন্দ্র প্রথমতঃ কুসুমকুলী এবং পিপলাই বংশের শ্রোত্রীয়গণকে হোসেনপুরে আনয়ন করেন। পরে কুসুমকুলী বংশের আত্মীয়স্বরূপ বাগপুর হইতে বটব্যাল বংশ আনিয়া হোসেনপুরে অবস্থিতি করেন। পিপলাই বংশে সূর্য্যনারায়ণ পিপলাই একজন খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী ছিলেন। গ্রামস্থ অপরাপর যে সকল কুলীন, বংশজ ব্রাহ্মণ আছেন, তাহারা রাজা রামচন্দ্রের বহুদিন পরে হোসেনপুরে আসিয়া বস-বাস করিতেছেন।

রাজ-পুরোহিত—রাজবাড়ীর লাগ দক্ষিণদিকে রাজ-পুরোহিত বাড়ী অবস্থিত ছিল, বর্ত্তমানে সেই স্থানে রামানন্দ বাউলের আখড়া বিদ্যমান আছে। রাজা রামচন্দ্র রায় যখন মাধবপাশায় চলিয়া যান, তৎকালীন আর

সমস্ত জ্ঞাতি হোসেনপুরে থাকিয়াই মাধবপাশার কার্য্যাদি করিতেন, কিন্তু রাজ-পুরোহিতকে রাজা আর ছাড়িলেন না; পুরোহিতকে নিয়া তিনি শ্রীনগরে বসাইলেন। শ্রীনগরের বর্ত্তমান ডাকনাম বাড়ৈথালী। এই রাজ-পুরোহিতবংশে স্বর্গীয় আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং জগবন্ধু বিদ্যারত্ন অতি নিষ্ঠাবান্ ও আচারপূত ব্রাহ্মণ ছিলেন। এই বংশে বর্ত্তমানে দুটী যুবক মাত্র বর্ত্তমান আছে; ইহারা পুরুষানুক্রমে হোসেনপুর আথড়া বাড়ীর কর পাইত, এক্ষণ পায় কিনা তাহা লেখক অবগত নহেন।

বৈদ্যজাতি—রাজা রামচন্দ্র রায় প্রথমতঃ ভরদ্বাজবংশীয় রামরত্ন দাসগুপ্ত কি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কেহকে আনিয়া হোসেনপুরে বসতি করান। হোসেনপুর রাজধানী থাকা পর্য্যন্ত ইহারা রাজার প্রধান অমাত্যের কার্য্য করিতেন। রাজা রামচন্দ্র রায়ের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ রায়ের আমলে মাধব-পাশা রাজধানীতে উক্ত রামরত্নের বংশধরগণ বক্সীর কার্য্যে নিযুক্ত হন। তদবধি পুরুষানুক্রমে বক্সীর কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন। পরলোকগত গঙ্গাগোবিন্দ দাসগুপ্ত রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়ের আমলে পুনঃ অমাত্যের পদে কার্য্য করিয়া সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। ইহারা চন্দ্রদ্বীপের রাজার অনুগ্রহে হোসেনপুরে দ্বিতল অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বিশিষ্ট ভূম্যধিকারী স্বরূপে অদ্যাপি বাস করিয়া আসিতেছেন। ইহারা বরোক্ত বক্সীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন বলিয়া এক্ষণও "বক্সী" উপাধীতে সাধারণ্যে বিখ্যাত আছেন।

কুলীন কায়স্থ—রাজা রামচন্দ্র রায়ের সময় বসুবংশীয় কুলীনগণ হোসেনপুরে যাহারা বসতি করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ঐ বংশীয় রাজচন্দ্র বসুর কোন বংশধর নাই। বর্ত্তমানে বসুবংশে দুটী প্রৌঢ় ব্যক্তি মাত্র বর্ত্তমান আছে।

খানসামা—রাজা রামচন্দ্র রায়ের খানসামাগণ মধ্যে শ্রীকান্ত খানসামা রাজার অতি প্রিয়পাত্র ছিলেন। ইহাকে রাজা অনুগ্রহ করিয়া যে ভূসম্পত্তি দিয়াছিলেন; তাহাতে হোসেনপুর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী বালীঘোনা গ্রাম এবং বর্ত্তমান স্বরূপকাঠী থানার অধীন সাতবাড়ীয়ার সম্পত্তিতে বার্ষিক তাহার ২০০০৲ টাকা আয় ছিল। বর্ত্তমানে খানসামাগণের ঐ সকল সম্পত্তির কিছুমাত্র বর্ত্তমান নাই। উহার অধিকাংশ রামচন্দ্রপুর নিবাসী স্বনাম প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী বাবু কালীপ্রসন্ন গুহ চৌধুরী তাঁহার ভ্রাতাগণ এবং হাইকোর্টের উকীল বাবু অবিনাশচন্দ্র গুহ চৌধুরী এম্, এ, বিএল্ খরিদ করিয়াছেন। খানসামা বাড়ীতে মনসাদেবীর ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির আছে। ইহারা বারমাসে তের পার্ব্বণ করিতেন। কালস্রোতে ইহাদের অবস্থা এরূপ শোচনীয় হইয়াছে যে, শুনিলে অশ্রু সম্বরণ করা যায় না। বাড়ীখানি প্রায় জঙ্গলাবৃত হইয়াছে; ইষ্টকনির্ম্মিত মনসাদেবীর ভগ্ন মন্দিরটী অধুনা অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই বংশে তিনটী যুবক ও একটী অল্প বয়স্ক ছেলে মাত্র বর্ত্তমান আছে। ইহাদের অধিকারে প্রসিদ্ধ রামানন্দ বাউলের আখড়াবাড়ী ছিল। রামানন্দ বাউলের এরূপ সাধনা ছিল যে, বহু দেশ দেশান্তর হইতে লোকে তাঁহাকে দেখিতে আসিত। অদ্যাপি রামানন্দ বাউলের আখড়ার নাম বহু দেশ বিখ্যাত আছে। এই আখড়ায় একটী প্রাচীন মন্দির আছে, এখানে রাসপূর্ণিমা উপলক্ষে প্রতি বৎসর একটী মেলা বসে। উক্ত খানসামাগণের অধিকারে খালের দক্ষিণপাড়ে বালীঘোনা গ্রামে "বশিষ্ঠ মুনি' নামধেয় একটী প্রাচীন দীর্ঘিকা আছে,দেখিলে বহুকালের বলিয়া ধারণা হয় এরূপ জনশ্রুতি আছে, বশিষ্ঠ মুনির কোন শিষ্যের বংশধর পশ্চিম দেশ হইতে ঐখানে আসিয়া প্রাচীনকালে ঐ দীঘিটী খনন করিয়া চলিয়া যান।

খাসকাল জাতি—রাজা রামচন্দ্র রায়ের আমলে রতিরাম খাসকাল প্রথম হোসেনপুরে বসতি করে। বর্ত্তমানে উক্ত খাসকাল বাড়ী ছাড়া রহিয়াছে। তাহাদের বংশধরগণ বর্ত্তমানে সাহেবগঞ্জের নিকট লক্ষ্মীপাশা গ্রামে গিয়া বাস করিতেছে। খাসকালগণ নিম্নশ্রেণীর কায়স্থ ছিল এবং তাহাদের নিম্নলিখিত কার্য্য ছিল; যথা—

চন্দ্রদ্বীপের সমাজস্থ কোন কায়স্থের স্বীয় পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে হইলে তাহাকে বিবাহের পূর্ব্বে রাজার অনুমতি লইতে হইত এবং রাজাকে রাজ-মাধ্যস্থ দিতে হইত। যদি কোন কুলীন কায়স্থ রাজার অনুমতি বিনা ঐ কার্য্য করিতেন, তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইত। রাজার খাসকালগণ ঐরূপ অপরাধী ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া রাজসমীপে উপস্থিত করিত। রাজা বিচার করিয়া তাহার দণ্ড বিধান করিতেন।

শঙ্খবণিক—রাজা রামচন্দ্রের আমলে অনেক শঙ্খবণিক জাতীয় লোক হোসেনপুরে আগমন করে, তন্মধ্যে বর্ত্তমানে কয়েকখানি বাড়ীতে লোক বর্ত্তমান আছে, অবশিষ্ট বাড়ীগুলি ছাড়া পড়িয়া রহিয়াছে। বর্ত্তমানে রাজার আমলের শঙ্খবণিক বংশধর মধ্যে কতিপয় শঙ্খবণিক অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, ইহাদের শঙ্খ-নির্ম্মিত শিল্প-নৈপুণ্য প্রশংসার যোগ্য।

গন্ধবণিক—এই জাতীয় লোকের কোন বংশধর এক্ষণ আর বর্ত্তমান নাই, ইহাদের বাড়ী বর্ত্তমানে জনৈক নমঃশূদ্র বাস করিতেছে।

মালাকর—রাজা রামচন্দ্র রাজধানীর দক্ষিণ ও রাজপুরোহিত বাড়ীর পূর্ব্বদিকে মালাকরদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। উক্ত মালাকর বংশ পরম্পরায় দুইটী প্রৌঢ় ও কতিপয় যুবক বর্ত্তমান আছে। ইহারা নিজ হোসেনপুর ও মাধবপাশা ভিন্ন রামচন্দ্রপুর, গাভা, নরোত্তমপুর প্রভৃতি বহু

গ্রামে বিবাহের ফুল-মুকুট যোগাইয়া থাকে এবং এ জিলার অন্যান্য মালাকর অপেক্ষা রাজার স্থাপিত মালী বলিয়া ইহারা মালাকর সমাজে উচ্চ আসন প্রাপ্ত হওয়ার রীতি আছে।

কুম্ভকার—এই জাতীয় লোকগণ রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল। ইহাদের কয়েকখানি বাড়ীর মধ্যে তুইটী প্রৌঢ় ও কতিপয় যুবক বর্ত্তমান আছে। ইহারা স্বীয় ব্যবসা ভিন্ন টালী ইট প্রস্তুত করিয়া প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকে।

তৈলিক ও কর্ম্মকার—এই জাতীয় লোকদের কোন বংশধর এক্ষণ বর্ত্তমান নাই। ইহাদের বাড়ী বর্ত্তমানে নমঃশূদ্রগণ বাস করিতেছে।

সাহাজাতি—পঞ্চকরণের নিকটবর্ত্তী স্থানে অদ্যাপি সাহাজাতির বাড়ী জঙ্গলাকীর্ণ অবস্থায় পতিত রহিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

হৈর্ম্ম্য নির্ম্মাণকারী রাজ—এই রাজবংশ নিম্নশ্রেণীর কায়স্থবংশ-সম্ভূত; এই বংশের ভৈরব রাজের অল্পদিন হয় মৃত্যু হইয়াছে। ইহাদের বাড়ী, রাজবাড়ীর উত্তর পূর্ব্বাংশে অবস্থিত।

পাটনী—পঞ্চনদের সঙ্গমস্থল পঞ্চকরণের অপরপাড়ে যাওয়ার জন্য জাঙ্গালের লাগ দক্ষিণাংশে পাটনী বাড়ী ছিল। ১০।১২ বৎসর হইল কলাড়ায় পাটনীবংশের কতিপয় পাটনীর মৃত্যু হওয়ায় অবশিষ্ট যুবকগণ অন্য দেশে চলিয়া গিয়াছে। এই পাটনীপাড়াকে অদ্যাপি পাটনীয়াকাঠী বলিয়া থাকে।

মাহার বা চাকর—এই বংশের কানাই প্রভৃতি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং ইহারা ডুলী বহিয়া থাকে।

নৌকার মাঝিগণ—রাজা রামচন্দ্রের ৬৪ দাড়ের একখানা প্রকাণ্ড পান্সী নৌকা ছিল। এতদ্ব্যতীত ছোট বড় আরও অনেক নৌকা ছিল। যেহেতু তৎকালীন চন্দ্রদ্বীপ নদী বহুল স্থান ছিল; সুতরাং এক স্থান হইতে অন্যত্র যাইতে হইলেই নৌকা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না; রাজার মাঝিগণ হোসেনপুরের উত্তরদিকে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিল। উক্ত মাঝিগণের একখানি স্বতন্ত্র হাট ছিল, তাহা অদ্যাপি মাঝির হাট নামে বিখ্যাত আছে। উক্ত হাটের উত্তরে একটী প্রকাণ্ড দীঘি আছে, তাহা অদ্যাপ মাঝির দীঘি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বহুকাল অতীত হইলে উক্ত মাঝিগণ তারুকাঠীর মিঞাবংশের সহিত প্রতিযোগিতায় না পারিয়া, মাঝির হাটের পশ্চিমদিকস্থ খালের পশ্চিমপাড়ে গিয়া বসতি করিতে থাকে। উক্ত মাঝি-গণের বংশধর জাহাঙ্গীর মাঝি, আব্বাছ মাঝি প্রভৃতি অদ্যাপি জীবিত আছে; তাহাদের বসতি স্থানগুলিকে অদ্যাপি "মাঝিগাতি" বলিয়া থাকে।

৺ রঘুনাথ ও অনন্তদেব বিগ্রহ স্থাপন।

রাজধানীর উত্তরদিকে রাজা দুটী বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং উভয় বিগ্রহের নৈমিত্তিক অর্চ্চনার জন্য প্রচুর দেবত্র ভূমি দান করেন। প্রায় ২৫ বৎসর অতীত হইল, ৺ রঘুনাথ বিগ্রহের সেবাইত জনৈক বৈষ্ণবংশধর উক্ত মূর্ত্তি লইয়া এ জিলার খলিশাকোটা গ্রামে গিয়া বসতি করিতেছেন। অনন্তদেবের বাড়ী প্রতি বৎসর মাঘী সপ্তমিতে মেলা বসিত। বহুদূর হইতে লোকসমূহ অনন্তদেবের প্রত্যক্ষের কথা শুনিয়া দর্শনাভিলাষে গমন করিত। গ্রামিক জনৈক বৈষ্ণবংশধর পুরুষানুক্রমে অনন্তদেবের সেবা করিয়া আসিতেছেন।

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের হোসেনপুরে অবস্থিতি।

পঞ্চকরণে হাট ও বাজার স্থাপন।

রাজা রামচন্দ্র রায় হোসেনপুর জয় করিয়া উপরোক্ত নানা শ্রেণীর লোক বসাইয়া এবং রাজধানীর পত্তন করিয়া রাজবাড়ীর দরজার পূর্ব্বদিকের শেষ সীমা পঞ্চকরণে একখানি বাজার বসান এবং বাজার ব্যতীত ঐ স্থানে সপ্তাহে দুইদিন হাটও বসিত। উক্ত হাট রাজা রামচন্দ্র রায়ের আমল হইতে রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত ছিল; অর্থাৎ চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের রাজা রামচন্দ্র রায় হইতে একাদশপুরুষ পর্য্যন্ত উক্ত হাট ছিল। বর্ত্তমানে উক্ত হাটের স্থানে সামান্য দুইখানি খড়ের ঘর মাত্র বর্ত্তমান আছে। উক্ত স্থানের বর্ত্তমান মালিক মাধবপাশার জমিদার বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরী। ১৮৬০ সনের থাক্‌বস্তার জরিপের সময় পঞ্চকরণ হাটের স্থানটুকুকে হোসেনপুর হইতে পৃথক্‌ভাবে পরিমাপ করিয়া পঞ্চকরণ হাট বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার হলকা বা রেভিনিউ সার্ভে নং ২১৮৮। পুরাকালে পঞ্চকরণ হাট একটী প্রধান বন্দর ছিল। রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়ের আমল পর্য্যন্ত উক্ত পঞ্চকরণ হইতে বড় বড় নৌকা পণ্যসম্ভারে বোঝাই হইয়া, দিগ্দিগন্তরে প্রেরিত হইত; উহা বাখরগঞ্জ জিলার বাণিজ্যের একটী কেন্দ্র-স্থল ছিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুলাই (বঙ্গাব্দ ১১৯৬ সালে) সেলিমা-বাদের জমিদারীর ॥১২॥/৴ ক্রান্তি অংশ ভূকৈলাসের ঘোষাল পরিবার (রাজা বাহাদুর) খরিদ করিয়া, ঝালকাঠী বন্দরে পরিণত করেন। ইতিপূর্ব্বে ঝালকাঠীতে কোন কারবার ছিল না, এবং নড়াল ষ্টেট হইতে সেলিমাবাদের ৫৭ গণ্ডা অংশ খরিদের পূর্ব্বে নবগ্রামেও কোন হাট ছিল না। তৎকালে বেড়মহলে ও প্রসিদ্ধ বামণের হাট ছিল না; সুতরাং তৎকালে একমাত্র পঞ্চকরণ বন্দরই বিশেষ সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান ছিল।

পঞ্চকরণের পূর্ব্বপাড় দিয়া পূর্ব্বমুখী পঞ্চনদের অপর একটী নদী বর্ত্তমান কালীজিড়া নদের সহিত মিলিত ছিল। বর্ত্তমানে আর উক্ত নদীর অস্তিত্ব নাই, সামান্য খাৎ মাত্র বর্ত্তমান আছে। উক্ত ক্ষুদ্র নদীর উত্তরপাড়ে একটী নীলকুঠীর আফিস ছিল। তৎকালে উহার নিকটবর্ত্তী আশিয়ার, বহরমপুর সৈদকাঠী প্রভৃতি স্থানে নীলের চাষ হইত এবং তাহার কারবার ছিল। নীল-কুঠীর ইষ্টক নির্ম্মিত আফিসবাটী জঙ্গলাকীর্ণ থাকিয়া অদ্যাপি অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়ের আমলে এখানে সপরিষদ্ নীলকুঠীর সাহেবগণ বাস করিতেন।

পঞ্চকরণস্থ পাঁচটী ক্ষুদ্র নদী দিয়া তৎকালে দিগ্দিগন্তর যাওয়ার সুবিধা ছিল। উহার একটী দক্ষিণে ঝালকাঠী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, একটি হোসেনপুর গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমদিক বেষ্টন করিয়া স্বরূপকাঠী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, একটি পূর্ব্ব উত্তরাভিমুখে গিয়া শুঠীয়া নদের সহিত মিলিত হইয়াছে, অপর একটি উত্তরাভিমুখে গিয়া উজিরপুর ও কমলাপুরের নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

রামচন্দ্রপুর গ্রাম স্থাপন।

হোসেনপুর রাজধানী স্থাপন করিয়া, রাজা রামচন্দ্র রায় বিশারীকাঠী, কাকরধা এবং কোষাবর হইতে যে সকল কুলীন কায়স্থ আনিয়াছিলেন, তাহাদিগকে হোসেনপুরের সপ্ত পশ্চিমে (খালের পশ্চিমপাড়ে) বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং নবাগত কায়স্থগণের অভিপ্রায় ও পরামর্শ মতে দেহেরগাতি হইতে রাজার জ্ঞাতিবংশের কতিপয় ব্যক্তিকে উক্ত খালের পশ্চিমপাড়ে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া, তথায় নিজ ব্যয়ে একটি প্রকাণ্ড

দীঘি খনন করিয়া তাহাদের আবাসভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দেন। উক্ত জ্ঞাতিগণ রাজা শিবনারায়ণ রায়ের সময় পুনরায় দেহেরগতি প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়ের আমলে চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় রাজন্যবর্গের জ্ঞাতিকুলের ভারতনারায়ণ বসুর পূর্ব্বপুরুষ আসিয়া, রাজা রামচন্দ্র রায়ের নির্দ্দেশিত বাড়ীতে বসতি করিতেছেন; বর্ত্তমানে ঐ বংশের নবীননারায়ণ বসু ও ষষ্ঠীনারায়ণ বসু বর্ত্তমান আছেন। রাজা রামচন্দ্র রায়ের জ্ঞাতিগণ ও তৎকর্ত্তৃক স্থাপিত কুলীন কায়স্থগণের অনুরোধে রাজা রামচন্দ্র রায় কতিপয় বৈদিক ব্রাহ্মণকে ঐ স্থানে স্থাপন করেন। উক্ত বৈদিকবংশে ৺ কালীকুমার শিরোমণি একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন, আচারপূত ও নিষ্ঠাবান্ বলিয়া তাঁহার সুনাম ছিল। তাঁহার বংশধরগণ অদ্যাপি তথায় বাস করিতেছেন। রাজা রামচন্দ্র রায়ের নামানুসারে উক্ত জনপদ বিশিষ্ট স্থান রামচন্দ্রপুর নামে অভিহিত হইয়াছে এবং অদ্যাপি উক্ত গ্রামের নাম ঐ নামেই প্রসিদ্ধ আছে। এ স্থানে রাজার হাট বলিয়া একখানি ভূখণ্ড আছে, সম্ভবতঃ রাজা তথায় হাট মিলাইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই নাম লুপ্ত হইয়াছে।

রাজা রামচন্দ্র রায়ের সময় উক্ত গ্রামের বিলভূমি ক্রমে উন্নত হইয়া লোক-বাসের যোগ্য হইয়াছিল। উহার পশ্চিমের স্থানগুলি "কাঁচাবালি" পূর্ণ ছিল বিধায় উহা অদ্যাপিও "কাঁচাবালিয়া" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। রামচন্দ্রপুরের দক্ষিণদিকের জলাভূমিকে "চর নারায়ণদী" বলিত এবং অদ্যাপি ঐ নামেই প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত চর শব্দের সহিত "নারায়ণ সংযুক্ত থাকায় উক্ত চর ভূমিগুলি রাজার আনিত জ্ঞাতিগণের স্বত্ব দখলে ছিল বলিয়াই অনুমান হয় এবং তাহাদের মালিক থাকারও প্রমাণ পাওয়া

যায়। উক্ত গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমের স্থানগুলি তের আনা পরিমাণ বিল ছিল বলিয়া অদ্যাপি সেই গ্রামকে তের আনা বলে। কাঁচাবালিয়ার পশ্চিম উত্তরে ভাদুসার প্রভৃতি গ্রাম অদ্যাপি বিলভূমিতে পরিণত রহিয়াছে। *

দুর্গ-নির্ম্মাণ।

রাজা রামচন্দ্র রায় পঞ্চকরণের অর্দ্ধ মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে গুঠীয়া নদীর সঙ্গমস্থলে "নয়াবাড়ী" নামধেয় স্থানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। উক্ত দুর্গের চতুর্দ্দিকে প্রায় ১০০ শত হাত দূর হইতে উহা ক্রমশঃ উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। উহা মৃত্তিকা নির্ম্মিত থাকিলেও উহার ভিতরে সৈন্য থাকিবার বিশেষ সুবিধা ছিল। বর্ত্তমানে উক্ত দুর্গের পশ্চিমদিকস্থ সামান্য চিহ্ন মাত্র বর্ত্তমান আছে। দুর্গের অবশিষ্ট স্থানগুলি গুঠীয়া নদীতে শিকস্ত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণ স্থানীয় কৃষকেরা উহাকে "কেল্লাঘাটা" বলিয়া থাকে। প্রধান সেনাপতি নানা ফর্ণাণ্ডিজের পর্ত্তুগীজ প্লান অনুসারে উক্ত দুর্গটী নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

মাধবপাশা রাজধানী নির্ম্মাণ।

প্রাচীনকালে মাধবপাশা, বাদলা, দেহেরগতি, প্রতাপপুর প্রভৃতি স্থান উত্থিত বিল ছিল, রাজা রামচন্দ্র রায় উক্ত বিলের মধ্যে রাজধানী স্থাপন

---

* রামচন্দ্রপুরের কায়স্থগণ মধ্যে বাবু কালীপ্রসন্ন গুহ বি এল, বাবু উমাপ্রসন্ন গুহ বি, এ, (ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট), বাবু তারাপ্রসন্ন গুহ বি, এল, বাবু অবিনাশ গুহ এম্, এ, বি, এল, কৃতবিদ্য ও স্বনাম প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, ইহারা এ জিলার প্রসিদ্ধ ভূস্বামীরূপে বস-বাস করিতেছেন। এই পরিবারের ন্যায় একত্রে সরস্বতী ও কমলার কৃপা লাভ করা প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। কাঁচাবালিয়া গ্রামে বসুবংশে বাবু রজনীনাথ বসু বি, এ, ডিপুটী মাজিষ্ট্রেট এবং তত্রত্য গুহবংশের বাবু কৈলাসচন্দ্র গুহ বরিশাল দেওয়ানী আদালতের উকীল এবং তৎপুত্র বাবু প্রিয়নাথ গুহ কলিকাতার "নায়ক" নামক দৈনিকপত্রের সম্পাদক।

কল্পা মনন করিয়া, হোসেনপুর থাকিয়াই মাধবপাশা রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। রাজধানীর স্থান নিম্নভূমি ও নবোত্থিত বিল থাকায়, উহা বাসোপযোগী করিতে রাজার বহুতর অর্থ ব্যয় হয়। তিনি প্রথমতঃ রাজধানীর পশ্চিমদিকে প্রতাপপুর হইতে কালীজিড়া নদী পর্য্যন্ত একটি খাল খনন করেন, তাহা "রাজার বেড়" বলিয়া অদ্যাপি খ্যাত আছে। তৎপর ক্রমশঃ রামসাগর, শুকসাগর নামে দুইটি প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেন; উহার একটি রাজধানীর পশ্চিমে ও একটি রাজধানীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত; এক্ষণ উহার একটির মধ্য দিয়া ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ডের রাস্তা গিয়াছে। তদ্ব্যতীত রাজবাড়ীর উত্তরদিকে দুইটি প্রকাণ্ড দীঘি এবং কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুকুর দৃষ্ট হয়। একটি ছোট দীঘির মাটীদ্বারা দোলমঞ্চ বান্ধা হইয়াছিল। এক্ষণও দোলমঞ্চের চূড়া দেখিতে মাথা উচু করিয়া উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হয়। বর্ত্তমান বাজারখোলার উত্তরাংশে অপর একটি প্রকাণ্ড দীঘি আছে এবং উক্ত দীঘির দক্ষিণপাড়ে একটি প্রকাণ্ড মন্দির দৃষ্ট হয়। মন্দিরের সম্মুখে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে; অপর দুটি মূর্ত্তি ঠিক্ করা যায় না। রাজবাড়ীর বসতিখণ্ডের পূর্ব্বদিকে প্রথমতঃ নহবৎখানার দালান, তৎপর নাটমন্দির বা চিলছত্র; চিলছত্রের উত্তরে দুর্গামন্দির, চিলছত্রের পশ্চিমদিকে ত্রিতল নন্দ মহল, তৎপশ্চিমে অন্দর মহলের অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। অন্দর মহলের ও নন্দমহলের দক্ষিণদিকে কাত্যায়নী ও মদনগোপালের বাড়ী। চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারী যে কাত্যায়নী ও মদনগোপাল মূর্ত্তি নদীগর্ভে পাইয়াছিলেন, সেই উভয় মূর্ত্তিই কচুয়া হইতে বিশারীকাঠী ও হোসেনপুর হইতে আনিয়া মাধবপাশায় উক্ত মূর্ত্তিদ্বয়ের নূতন অভিষেক ও প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল। কাত্যায়নী ও মদনগোপালের বাড়ীর উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণের ভিটায়

প্রাচীনকালীয় তিনটি 'ঝিকটি' দালান অবস্থিত আছে। তন্মধ্যে একটিতে কাত্যায়নী মূর্ত্তি ও অপর একটিতে মদনগোপালের মূর্ত্তি এবং অবশিষ্টটিতে অন্যান্য বিগ্রহ স্থাপন করা হইয়াছিল। রাজবাড়ীর দক্ষিণদিকে শিববাড়ীর দালান অবস্থিত আছে। শিববাড়ীর দিকে রাজার কোষ নৌকা রক্ষার জন্য এক ডকের ন্যায় স্থান খনন করা হয়, তাহা অদ্যাপি 'কোষঘাটা' বলিয়া বিখ্যাত আছে। বর্ত্তমানে উক্ত কোষঘাটা স্থান দিয়া ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড কর্ত্তৃক ভেদরিয়া নামক খাল খনন করা হইয়াছে।

যশোহর যাত্রার বন্দোবস্ত।

রাজা রামচন্দ্র রায় মাধবপাশা রাজধানীর কার্য্য শেষ করিয়া সস্ত্রীক নূতন রাজধানীতে প্রবেশ করার জন্য রাণী বিন্দুমতীকে আনিতে যশোহর গমনের বন্দোবস্ত করেন। তিনি বিবাহের পর আর শ্বশুরালয় যান নাই। তৎপর পিতৃবিয়োগ, এবং রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, দেশ হইতে দেশান্তর ভ্রমণে রাজা রামচন্দ্রের কিয়ৎকাল অতিবাহিত হয়। নূতন রাজধানীতে সস্ত্রীক অভিষিক্ত হওয়া প্রয়োজন, বিশেষ রাণী বিন্দুমতীও তখন বয়স্থা হইয়াছেন; সুতরাং, তিনি প্রধান ওলন্দাজ সেনাপতি নানা ফর্ণাণ্ডিজ এবং কতিপয় অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য এবং শরীররক্ষক রামমোহন মাল ও রমাই ভাঁড় প্রভৃতি শতাধিক লোকজন সমেত যশোহর যাত্রার বন্দোবস্ত করেন।

প্রতাপাদিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী
চণ্ডশ্চ ভৈরবো যত্র তত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।

শব্দকল্পদ্রুম।

যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতশায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত নৃপতি দ্বারস্থ॥
বড় পুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যাঁর ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাতি
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥

(ভারতচন্দ্র)।

ইংরেজী ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে এবং বঙ্গাব্দ ৯৬৮ সালে যশোহর নগরে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতে তিনি অত্যন্ত তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। প্রতাপাদিত্যের পিতা বিক্রমাদিত্য এবং তস্য পিতৃব্য বসন্ত রায় কৈশোরেই তাঁহাকে দীল্লিতে বাদসাহের দরবারে প্রেরণ করেন। প্রতাপাদিত্য অতি অল্প সময়েই স্বীয় প্রতিভাবলে বাদসাহের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন এবং আকবর বাদসাহ হইতে নিজ নামে সনন্দ গ্রহণপূর্ব্বক যশোহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। বাল্যকাল হইতে তাঁহার হৃদয়ে স্বাধীনতার ভাব বদ্ধমূল হয় এবং বঙ্গভূমি বিধর্ম্মী রাজার করতলস্থ দেখিয়া, তিনি কি

প্রকারে বঙ্গভূমিকে মুসলমানদের কবল হইতে মুক্ত করিবেন, অহর্নিশি এই চিন্তা করিতে থাকেন। এই সকল কারণে তিনি যশোহরে আসিয়াই স্বীয় বাসনা কার্য্যে পরিণত করার উদ্দেশে প্রথমতঃ পিতৃব্য বসন্ত রায় সহিত পৃথক্ হইয়া, তাঁহাকে রায়গড় দিয়া নিজে ধূমঘাট নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করিতে মনস্থ করেন। তৎপর রাজ্যের চতুর্দ্দিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নানাস্থানে ঘাটী বসাইবার জন্য তাঁহার চাক্‌সিরি পরগণা নামক স্থানের একান্ত আবশ্যক হয়, তৎকালে উক্ত স্থান পরাক্রান্ত চন্দ্রদ্বীপাধিপতি কন্দর্প-নারায়ণ রায়ের অধিকারভুক্ত ছিল। তিনি বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজে সর্ব্বপ্রধান সমাজপতি ছিলেন। * চাক্‌সিরি পরগণার আবশ্যক নিবন্ধন কৌশলী প্রতাপাদিত্য আপন দুহিতা বিন্দুমতীকে রাজা রামচন্দ্র রায়ের করে অর্পণ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন। অবশেষে কিছুদিন পরেই যশোহর নগরীতে ধুমধামের সহিত উক্ত বিবাহ কার্য্য সমাধা হয়। সম্ভবতঃ প্রতাপাদিত্যের পক্ষীয় লোকের ইঙ্গিতে রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় উক্ত দক্ষিণ রাজ্য (সুন্দরবন) ত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ উত্তরদিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

অতঃপর মহারাজ প্রতাপাদিত্য শঙ্কর চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক বিচক্ষণ ব্যক্তিকে সমর-সচিব নিযুক্ত করিয়া, তৎকালীয় রুডা নামিক জনৈক পর্টুগীজকে আপন সৈন্যদলভুক্ত করেন এবং তাহার দ্বারা সৈন্যগণকে সুশিক্ষিত করেন। সূর্য্যকান্ত গুহ নামে জনৈক বলিষ্ঠ যুবককে প্রধান সেনাপতি করিয়া তদধীন রঘু, মদন প্রভৃতি বীরপুরুষগণ ও কমল খোজাদ্বারা একদল অশ্বারোহী সৈন্য সংগঠন করেন। এই প্রকার সৈন্যদল ও গোলা বারুদ,

* চন্দ্রদ্বীপঃ শিরঃ স্থানং বঙ্গ কুলানমণ্ডলং। কায়স্থ কারিকা।

কামান, বন্দুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহপূর্ব্বক ক্রমশঃ বঙ্গের অন্যান্য একাদশ ভূঞা এবং অন্যান্য নরপতিকে আপন দলভুক্ত করেন, তৎপরে ধুমঘাটে রাজধানী স্থাপন করতঃ নূতন অভিষিক্ত হইয়া নিজে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। এদিকে ক্রমে প্রতাপাদিত্যেব এই স্বাধীনতা ঘোষণার বাণী দিল্লীশ্বরের কর্ণগোচর হইলে, তিনি প্রতাপাদিত্যকে দমন করার জন্য প্রথমতঃ সেরখাঁকে বহুতর সৈন্য সমভিব্যাহারে যশোহরে প্রেরণ করেন। পরে উভয় পক্ষে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। সেই যুদ্ধে প্রতাপাদিত্য সেরখাঁকে পরাস্ত করিয়া তাহাকে বন্দী করেন। তৎপর ক্রমিক ৭।৮ বার তাঁহার জন্য দিল্লীশ্বর আকবর দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল প্রেরণ করেন; কিন্তু প্রতাপাদিত্য অমিততেজে তাহাদের সকলকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বঙ্গের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখেন। তৎপর আকবরের মৃত্যু হইলে, সম্রাট-পুত্র জাহাঙ্গীর সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াই প্রথমতঃ প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে কৃতসঙ্কল্প হন এবং স্বীয় শ্যালক মানসিংহকে যোগ্য ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া বহুতর সৈন্য সামন্ত সহ তাঁহাকে যশোহরে প্রেরণ করেন। রাজা মানসিংহও ক্রমিক দুইবার পরাভূত হন। তৃতীয়বার যুদ্ধে জ্ঞাতি-শত্রু প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায়ের পুত্র রাঘব নামান্তর কচুরায় হঠাৎ বিপক্ষ-পক্ষে যোগদান করিয়া যুদ্ধের সময় প্রতাপাদিত্যের মৃত্যু সংবাদ রটনা করিলে প্রতাপাদিত্যের সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়ে এবং প্রতাপাদিত্য পরাজিত ও বন্দী হইয়া দীল্লীতে প্রেরিত হন; কিন্তু দিল্লীতে পৌছিবার পূর্ব্বেই পথিমধ্যে কাশীধামে তাঁহার মৃত্যু হয়। কথিত আছে, তাঁহার মৃত শরীর এক লৌহ পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া দিল্লীতে প্রেরিত হইয়াছিল; দিল্লীশ্বর সেই শরীর দর্শন করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এমন বলিষ্ঠ শরীর মৃতাবস্থায় আমার

নিকট না পাঠাইয়া, জীবিতাবস্থায় পাঠান উচিত ছিল। জাতি-বিরোধেই বঙ্গদেশ উৎসন্ন গেল। না হইলে সম্ভবতঃ যশোহর হইতে বঙ্গের স্বাধীনতা-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইত না।

প্রতাপাদিত্য বাঙ্গালী জাতির শিরোমণি ছিলেন, তিনি যেমন সত্যবাদী ছিলেন, তেমন স্বদেশ ও স্বদেশবাসীকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন। তিনি আমরণকাল কিসে বাঙ্গালীর উন্নতি হইবে, সেই চিন্তা করিয়া নিজের জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন। তিনি দেব দ্বিজে ভক্তিপরায়ণ এবং অতীব দানশীল নরপতি ছিলেন। তাঁহার অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি একমাত্র চন্দ্রদ্বীপ ভিন্ন তৎকালীন আর যত হিন্দু রাজা ছিলেন, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া নিজে করায়ত্ত করেন। তাঁহার আর একটী গুণ ছিল যে, তিনি যাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিতেন, তাঁহার সম্পত্তি তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়া আসিতেন এবং তাঁহাকে মাত্র স্বদেশবাসীর ও তাঁহার সাহায্য করিতে পরামর্শ দিতেন। প্রতাপাদিত্য উড়িষ্যাও জয় করিয়াছিলেন এবং বহুদিন যাবৎ উড়িষ্যার নরপতি প্রতাপাদিত্যের অধীনে ছিলেন। একমাত্র চন্দ্রদ্বীপ অধিকারস্থ জনপদ ভিন্ন সমগ্র বঙ্গদেশের উপর তাঁহার একচ্ছত্র প্রভুত্ব ছিল। চন্দ্রদ্বীপ অধীশ্বরকে তিনি বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজের সমাজপতি ও অগ্রণী বলিয়া মান্য করিতেন, কিন্তু রাজা হিসাবে তাঁহার প্রাধান্যতা স্বীকার করিতেন না। তাঁহার জ্ঞাতি-শত্রু কচু রায় দিল্লীতে গিয়া ঘরভেদী বিভীষণের ন্যায় প্রতাপাদিত্যের সমস্ত অভ্যন্তরীণ সংবাদ মানসিংহকে বলিয়া না দিলে এবং সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া যুদ্ধের সাহায্য না করিলে কস্মিন্‌কালেও প্রতাপাদিত্যের ঐরূপ অকাল মৃত্যু সংঘটিত হইত না। তাঁহার অশ্বারোহী, পদাতিক ও ঢালীতে

প্রায় দুই লক্ষ সৈন্যের সমাবেশ ছিল। রাজা মানসিংহ না হইলে, স্বয়ং দিল্লীশ্বর তাঁহাকে দমন করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। বঙ্গদেশে এক্ষণও যেরূপ জাতি-বিরোধ দৃষ্ট হয়, তাহাতে এ জাতির উন্নতি সুদূরপরাহত। *

রাজা রামচন্দ্র রায়ের যশোহর গমন।

প্রতাপাদিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল। রাজা রামচন্দ্র রায়ের যশোহর গমনের বৃত্তান্ত বলা হইতেছে ;—রামচন্দ্র রায় পূর্ব্ব কথিত মতে সমস্ত লোকজন সহ হোসেনপুর হইতে যশোহর রওনা হন এবং কতিপয় দিবস পরে তাহার ৬৪ দাড়ের পান্সী ভৈরব নদ বাহিয়া প্রতাপাদিত্যের রাজধানীর সন্নিকট এক খালের মধ্যে আসিয়া নোঙ্গর করে। মহারাজ প্রতাপাদিত্য জামাতাকে তাঁহার অমাত্যগণদ্বারা বিশেষ আদর আপ্যায়িত করিয়া রাজধানীতে লইয়া যান। রাজা রামচন্দ্র রায় তখনও অল্প বয়স্ক যুবক, তিনি এক খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া, সঙ্গীয় রমাই ভাঁড়কে স্ত্রীবেশ সাজাইয়া অন্তঃপুরে নিয়া যান এবং তাঁহার সম্পর্কীয়া শ্যালিকাগণ নানাবিধ বিদ্রুপাত্মক কথা বলিলে রামচন্দ্রের পরিবর্ত্তে সেই স্ত্রীবেশধারী রমাই ভাঁড় তাঁহাদের কথার তীব্র উত্তর প্রদান করে ; ইহাতে তাঁহাদের সন্দেহ হয় এবং

---

* বরিশাল জিলার বাণরিপাড়ার গুহঠাকুরতাগণ বলেন—যুদ্ধ বিশারদ জিতামিত্র গুহ, মহারাজ প্রতাপাদিত্য, রাজা বসন্ত রায়, চাঁদ রায় প্রভৃতি উক্ত গুহবংশসম্ভূত। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ভ্রাতা নয়নানন্দ গুহসরকার এই জিলার কাকরধী গ্রামে আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার বংশপরম্পরা ব্যক্তিগণ বাণরিপাড়া গ্রামে গিয়া বাস করিতেছেন। প্রকৃত ইতিহাস আলোচনা করিলে শেষভাগের কথাগুলির সত্যতা প্রতিপন্ন হয় না। লেখক।

রমাই ভাঁড় যে পুরুষ তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। ক্রমে এই কথা মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কর্ণগোচর হয়। প্রতাপাদিত্য এবম্বিধ আচরণকে অত্যন্ত ঘৃণিত ও তাঁহার অপমানজনক মনে করিয়া এবং রামচন্দ্রকে তাঁহার জ্ঞাতি-শত্রু বসন্ত রায়ের সহিত পরামর্শ করিতে দেখিয়া, রামচন্দ্রের প্রতি এতদূর কুপিত হন যে, অবিলম্বে রামচন্দ্রের শিরচ্ছেদ করিবেন বলিয়া আদেশ করেন। প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য ভগিনীপতির এবম্বিধ আকস্মিক বিপদবার্ত্তা অবগত হইয়া গভীর নিশীথে উহা রামচন্দ্রের কর্ণগোচর করেন। রামচন্দ্র ইহা শ্রবণে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, জীবনরক্ষক রামমোহন মালকে উহা জ্ঞাপন করান। তৎপর উদয়াদিত্য, রামমোহন ও রামচন্দ্র এই তিনজন ঐ রাত্রেই রাজধানী পরিত্যাগ করা স্থির করেন। তদনুসারে উদয়াদিত্য সীতারাম নামক একজন শাস্ত্রীর সহায়তায় রামচন্দ্রকে অন্তঃপুরের প্রথম ফটক মুক্ত করিয়া দিলে, মহাবল রামমোহন রামচন্দ্রকে পৃষ্ঠে ঝুলাইয়া দ্বিতল অট্টালিকা হইতে রজ্জুর সাহায্যে নীচে অবতরণ করেন এবং নৌকায় উঠিয়া অবিলম্বে নৌকা খুলিয়া দেন। যে খালের মধ্যে নৌকা নোঙ্গর করা ছিল ; এরূপ জনশ্রুতি আছে যে, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আদেশে তথায় মধ্যে মধ্যে বৃহৎ শালবৃক্ষ ফেলিয়া নৌকার গতিরোধ করার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল ; কিন্তু মহাবল রামমোহনের অসীম সাহসে নৌকা ঐরূপ বাধা অতিক্রম করিয়া ঐ রাত্রি মধ্যেই ভৈরব নদে পতিত হয়। ভৈরব নদে পড়িবামাত্রই সেনাপতি ফর্ণাণ্ডিজ মুহুর্মুহু তোপধ্বনি করেন ; কিন্তু মহারাজ প্রতাপাদিত্য জানিতে পারিয়াও আর অগ্রসর হন নাই। পর দিবস উদয়াদিত্যকে রামচন্দ্রের মুক্তির কারণ জানিয়া প্রতাপ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করেন। এদিকে রাজা রামচন্দ্র কয়েক দিন মধ্যেই হোসেনপুর পৌঁছিয়াই

সদলবলে মাধবপাশা নূতন রাজধানীতে চলিয়া যান এবং মাধবপাশা গিয়া কি প্রকার শ্বশুরকে এই অপমানের প্রতিশোধ দিবেন তাহা ভাবিতে থাকেন।

রামমোহনের পুনঃ যশোহর গমন।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য রাজা রামচন্দ্রের শিরচ্ছেদের আদেশ করায় অনেকে প্রতাপাদিত্যকে নির্ম্মম মনে করিতে পারেন; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালী অপেক্ষা তাঁহার মানসিক বল সহস্রগুণে বর্দ্ধিত ছিল। স্নেহের পুত্তলী দুহিতা বিধবা হইবে, এই ভীতিব্যঞ্জক-দুর্ব্বলতা তাঁহার হৃদয়ে আদৌ স্থান পায় নাই; তখন প্রতাপাদিত্যের পরিবারস্থ লোকে নিজেদের জীবনাপেক্ষা সম্মানকেই বড় মনে করিতেন। রাজা রামচন্দ্র যেমন বাল-স্বভাব-সুলভ ইতর জনোচিত কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহাতে অবস্থা বিশেষে ঐরূপ আদেশ দেওয়ার জন্য প্রতাপাদিত্যকে সম্পূর্ণ দোষী করা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ কথাটা প্রতাপাদিত্যের কর্ণে যে অতি রঞ্জিতভাবে উঠিয়াছিল, তাহা নিঃসংশয় মনে করা যাইতে পারে।

রাজা রামচন্দ্র দেশে আসিলে রামমোহন মাল অবসর বুঝিয়া যশোহর যাইয়া রাণীকে আনিবার জন্য রাজাকে পরামর্শ দিতে লাগিলেন এবং এ ক্ষেত্রে রাজকুমারী বিন্দুমতী যে নির্দ্দোষী তাহা রাজাকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া যশোহর যাওয়ার অনুমতি চাহিলেন। ক্রমিক রামচন্দ্রের মনটি রাজকুমারী বিন্দুমতীর দিকে আকৃষ্ট হইল এবং তিনি একদিন রামমোহনকে যশোহর যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

রামমোহন রাজার অনুমতি লাভ করিয়া যশোহর রাজধানীতে গিয়া রাণীকে প্রণাম করিলেন; পুরনারীগণ রামমোহনকে দেখিয়া আশাতীত সন্তুষ্ট হইলেন। এবারে স্বয়ং প্রতাপাদিত্য কন্যাকে শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করার

জন্ত বিবিধ প্রকার উদ্যোগ করিয়া দিলেন। রওনায় সমস্ত ঠিক্ হইলে রাণী বিন্দুমতী যাত্রা করিয়া বয়োজ্যেষ্ঠাদিগকে প্রণামাদি করিয়া যেখানে ভ্রাতা উদয়াদিত্য বন্দী ছিলেন, তথায় গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। উদয়াদিত্য বিন্দুমতীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "বিন্দু! তুমি ত চলিয়া গেলে, আমার আর কোন গতি হইল না?" সহসা এই কথা শুনিয়া বিন্দুমতী হঠাৎ যেন একটু অপ্রতিভ হইলেন এবং ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া রামমোহনকে বলিলেন, আমার এবার যাওয়া হইবে না। হঠাৎ বিন্দুমতীর মুখে এই কথা শুনিয়া সকলে স্তম্ভীত হইলেন এবং রাজকুমারীকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ঐরূপ তিরস্কার শ্রবণে তিনি কেবল রোদন করিলেন মাত্র; কিন্তু না যাওয়ার কি কারণ আছে, তাহা সর্ব্বজন সমক্ষে প্রকাশ করিলেন না, ইহাই তাঁহার ভবিষ্যৎ সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইয়া রহিল। রামমোহন মাল অগত্যা ক্ষুণ্নমনে মাধবপাশা ফিরিয়া আসিলেন।

রাজা রামচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পরিণয়।

রামমোহন মাল যশোহর হইতে একাকী ফিরিয়া আসিলে পর রাজা তাহাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিলেন এবং বলিলেন যে, আমি প্রথমেই তোমাকে নিষেধ করিয়াছিলাম; রামমোহন ম্রিয়মাণ হইয়া রহিলেন। তৎপর প্রাচীন আত্মীয়বর্গের অভিমতানুসারে দ্বিতীয় পরিণয় করা সাব্যস্ত করিলেন এবং তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য নয়ানচাঁদকে এক পত্র দিয়া যশোহর পাঠাইলেন। পত্রের মর্ম্ম ছিল যে, "যশোহর রাজের সহিত তিনি আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন করিলেন এবং রাজকুমারী বিন্দুমতীকে আর তিনি পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহেন।"

রাজা রামচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পরিণয়।

নয়ানচাঁদ যথাসময়ে যশোহর রাজধানীতে পৌঁছিয়া চিঠি প্রতাপাদিত্যের গৃহিণীর নিকট অর্পণ করিলেন। তিনি চিঠির মর্ম্ম অবগত হইয়া নীরবে রোদন করিলেন এবং গোপনে স্বামীর সহিত পরামর্শ করিয়া বিন্দুমতীকে অবিলম্বে চন্দ্রদ্বীপ প্রেরণ করা স্থির করিলেন। ক্রমে রওনার উদ্যোগ চলিতে লাগিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য অপরিমিত ধনরত্ন এবং বহুতর অনুচর ও রাজকুমার উদয়াদিত্যকে সঙ্গে দিয়া এক প্রকাণ্ড বজরা নৌকায় তাঁহাদিগকে চন্দ্রদ্বীপ রওনা করিয়া দিলেন।

এ দিকে রাজা রামচন্দ্র রায় বর্ত্তমান বাথরগঞ্জ জিলাবাসী লব্ধপ্রতিষ্ঠ শম্ভুচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের দুহিতার পাণিগ্রহণ করা সাব্যস্ত করিয়া অবিলম্বে বিবাহের তারিখ ধার্য্য করিয়া ফেলিলেন। রাজোচিতভাবে বিবাহের উদ্যোগ আয়োজন সবেগে চলিতে লাগিল এবং দেখিতে দেখিতে বিবাহের দিন আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিবাহের পূর্ব্বদিন রাণী বিন্দুমতীর বজরা যশোহর হইতে রওনা হইয়া হোসেনপুরের খালে মাঝির হাটখোলার পশ্চিমপাড়ে আসিয়া নোঙ্গর করিল। বজরার অনুচরগণ হোসেনপুর নগরীতে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, রাজা রামচন্দ্র রায় মাধবপাশা নূতন রাজধানীতে চলিয়া গিয়াছেন। তদনুসারে বিবাহের দিন রাণীর বজরা মাধবপাশাভিমুখে রওনা হইল এবং রাজার বেড় বা মাধবপাশার খাল যেস্থানে আসিয়া কালীজিড়া নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই খাল ও নদীর সঙ্গমস্থলে বজরা নোঙ্গর করিয়া রহিল। রাণী বিন্দুমতী হোসেনপুর খালের পশ্চিমপাড়ে নৌকা নোঙ্গর করায় উহা অদ্যাপি রাণীপুর বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। এক্ষণও প্রাচীন কি আধুনিক দলীলপত্রে উক্ত স্থান রাণীপুর বলিয়াই উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই

রাণীপুর নামধেয় অনতিবিস্তৃত জনপদ হোসেনপুর বক্সী পরিবারের তালুক-ভুক্ত এবং অদ্যাপি বক্সিগণ ইহার ভূম্যধিকারী বর্ত্তমান আছেন।

বউ ঠাকুরাণীর হাট।

রাজকুমার উদয়াদিত্য মাধবপাশার খাল ও কালীজিড়া নদীর সঙ্গম স্থলে নৌকা নোঙ্গর করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে রাজবাড়ীর নহবৎ বাজনা ও অন্যান্য বাদ্যভাণ্ড শ্রবণ করিয়া রাত্রিযোগে ছদ্মবেশে রাজধানীতে গিয়া অবগত হন যে, গোধূলিলগ্নে রাজা রামচন্দ্র রায়ের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। উদয়াদিত্য নৌকায় ফিরিয়া আসিয়া এই কথা ভগিনী বিন্দুমতীকে জানাই-লেন। বিন্দুমতী তাঁহার ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট চিন্তা করিয়া নীরবে রোদন করিতে লাগিলেন এবং রাজবাড়ী আর না গিয়া আপন বজরায় থাকিয়া গেলেন। রাণীর আবশ্যকীয় দধি দুগ্ধ ও মৎস্যাদি খরিদ জন্য তথায় একখানি হাট বসিয়াছিল। রাণী যতদিন ঐ স্থানে বজরা নোঙ্গর করিয়াছিলেন, ততদিনই ঐ স্থানে প্রত্যহ হাট বসিত এবং তজ্জন্য অদ্যাপি উক্ত স্থান বউঠাকুরাণীর হাট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সম্প্রতি উক্ত স্থানে চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশীয় প্রহরী-গণের বংশগত মাধবপাশার নিকটবর্ত্তী হাদিবসকাঠী নিবাসী বলরাম সিং ও তাহার সহযোগী কলমদার খাঁ নামিক জনৈক মুসলমানের প্রযত্নে উক্ত "বউ ঠাকুরাণীর হাট" নামধেয় ভূমিখণ্ডে একখানি হাট বসিয়াছে। প্রতি সপ্তাহে শনিবার ও মঙ্গলবার তথায় হাট বসে। কালীজিড়া নদী পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া যেস্থান দিয়া দক্ষিণদিকে প্রবাহিত হইয়াছে, ঐ সঙ্গমস্থলে এখন অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর বহুদূর হইতে দৃষ্ট হয়। তাহাই এখন বহুদূর হইতে প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করিয়া, বর্ত্তমান চন্দ্রদ্বীপ অধিবাসিগণকে অতীতের ক্ষীণ স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে।

রাণী বিন্দুমতীর সারসীতে অবস্থিতি।

বউঠাকুরাণীর হাট নামধেয় স্থানে রাণী বিন্দুমতী চারিমাসকাল থাকিয়া রাজাকর্ত্তৃক উপেক্ষিত কি অনুপেক্ষিত কিছুই বুঝিতে না পারিয়া তথাহইতে রওনা হইয়া লাখুটীয়ার সন্নিকট বিল্ববাড়ী ও সারসী গ্রামের নিকটবর্ত্তী পূর্ব্বমুখী প্রবাহিতা ক্ষুদ্র নদীতে বজরা নোঙ্গর করিয়া থাকেন; তথায় তিনি কখন কখন তীরে তাঁবু ফেলিয়া তাহার মধ্যে উঠিয়া বসিতেন; এদিকে স্থানীয় অধিবাসিগণের জল কষ্টের কথা রাণীর কর্ণগোচর হইলে তিনি সারসী গ্রামে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করিয়া তাহা উৎসর্গ করেন এবং তদুপলক্ষে নিকটস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও গরীব দুঃখীকে যথেষ্ট অর্থ দান করেন। রাণী বিন্দুমতীর এবম্বিধ সৎকার্য্য ও দানশীলতার কথা মাধবপাশা রাজধানীতে আলোচিত হইলে, ক্রমে উহা অন্দরমহলে রাজমাতার কর্ণগোচর হয়। তৎপর রাজমাতা বিশিষ্ট লোক দ্বারা রাণী বিন্দুমতীর আগমন বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়া, স্বয়ং পুরনারীগণ সমভিব্যাহারে শিবিকাসহ সারসীতে আগমন করেন। রাজমাতা গিয়া নববধূর সহিত দেখা করিলে, রাণী বিন্দুমতী শাশুড়ীকে এক থাল মোহর দিয়া প্রণাম করিলেন এবং রাজমাতাও যথাবিধানে বধূকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপর উদয়াদিত্য আসিয়া রাজমাতাকে প্রণাম করিয়া পূর্ব্বাপর আবৎ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। উদয়াদিত্য প্রমুখাৎ রাজমাতা যশোহর সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, অত্যন্ত বিষমানা হইলেন এবং তাঁহার আদেশে অবিলম্বে পুত্রবধূ এবং উদয়াদিত্য ও তৎসহচরগণ সহ মাধবপাশা রাজধানীতে উপনীত হইলেন। রাজা রামচন্দ্র রায় রাণী বিন্দুমতীর রাজপুরীতে আগমন জানিয়া, পূর্ব্ব জাতক্রোধে ক্রমিক

তিনদিন যাবৎ কিছুতেই দেখা করিলেন না; পরন্তু, নিজ শয়নকক্ষের কপাট বন্ধ করিয়া রহিলেন। তৎপর উদয়াদিত্যের অনেক অনুনয় বাক্যে বাধ্য হইয়া চতুর্থ দিন বাহির হইলেন এবং তাঁহার অনুচর ও সঙ্গীয় লোকদিগকে চন্দ্রদ্বীপে রাখিয়া একাকী উদয়াদিত্যকে আপন ভৃত্য নয়ানচাঁদের সহিত যশোহরে প্রেরণ করিলেন।

রাজা রামচন্দ্র রায় অত্যন্ত মাতৃভক্ত ছিলেন। রাণী বিন্দুমতীকে তিনি প্রথমতঃ গ্রহণ করিবেন না বলিয়াই মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে মাতার নিতান্ত অনুরোধে তাঁহাকে গ্রহণ করেন। রাণী বিন্দুমতীও স্বীয় বুদ্ধিবলে ক্রমশঃ রাজার হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন। কালক্রমে রাণী বিন্দুমতীর গর্ভে মহাবল কীর্ত্তিনারায়ণ রায় জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজার দ্বিতীয় পরিণীতা স্ত্রীর গর্ভে বাসুদেবনারায়ণ রায় নামক এক পুত্র হয়। *

---

* এই ঘটনাকে সাহিত্য সম্রাট শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎকৃত বউঠাকুরাণীর হাট নামক গ্রন্থে অত্যন্ত বিকৃতভাবে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তিনি রাজা রামচন্দ্র রায়ের যে কুৎসিত চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা তাঁহার ন্যায় প্রবীণ ব্যক্তির উচিত হয় নাই। লেখক স্থানীয় লোক তজ্জন্য তাঁহার ঐরূপ চিত্র দেখিয়া বিশেষ কষ্টানুভব করিয়াছেন। স্বর্গীয় বাবু ব্রজসুন্দর মিত্র তৎকৃত চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশে রাণী বিন্দুমতীকে মিলন না করাইয়াই কাশীতে পাঠাইয়াছেন; কিন্তু তাহাও ঠিক নহে। রাণী বিন্দুমতীকে রাজা রামচন্দ্র মাতৃ অনুরোধে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তৎগর্ভে মহাবল কীর্ত্তিনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন এবং রাজা রামচন্দ্র রায়ের লোকান্তরে এই কীর্ত্তিনারায়ণই রাজা হইয়া অক্ষয় কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন রাজা রামচন্দ্রকে তদীয় শ্বশুর প্রতাপাদিত্য বিবাহ রাত্রিতে সম্প্রদানের পরই নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য হস্তগত করিবেন, এরূপ কলঙ্কের কথা প্রতাপাদিত্যের প্রতি আরোপ করিয়াছেন; ফলতঃ ইহা সম্পূর্ণ অমূলক। যেহেতু রামচন্দ্রের বিবাহ সময় তদীয় পিতা কন্দর্পনারায়ণ রায় জীবিত ছিলেন;

কাশীপুরে ব্রাহ্মণ স্থাপন।

হোসেনপুর হইতে আসিবার সময় রাজা রামচন্দ্র রায় একমাত্র রাজ-পুরোহিত ব্যতীত আর কোন ব্রাহ্মণই সঙ্গে আনিতে পারেন নাই; সুতরাং রাজধানী মাধবপাশার অনতিদূরে কাশীপুর গ্রামে কতিপয় ব্রাহ্মণ আনিয়া তাঁহাদিগকে যথারীতি বৃত্তিভূমি প্রদান করতঃ তথায় তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। কাশীপুরে রাজা যে সকল জন-হিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল;—

গণপাড়া পল্লী—এই পল্লীতে জল-কষ্ট দেখিয়া রাজা এক দীঘি খনন করিয়া দেন এবং স্বীয় পিতৃ নামে উক্ত জলাশয় উৎসর্গ করেন, অদ্যাপি উক্ত দীঘি কন্দর্পনারায়ণ রায়ের দীঘি নামে প্রসিদ্ধ আছে। এই পল্লীতে রাজার আনীত গুড় শ্রোত্রীয় বংশের রমাকান্ত বিদ্যাভূষণ, হরিরাম ন্যায়পঞ্চানন, রামকেশব পঞ্চানন, দেবীচরণ বাচস্পতি, রামশরণ বিদ্যাবাগীশ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন এবং রামকৃষ্ণ গুড় নামে এই বংশে এক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল, তিনি নবাব সরকারে দরবার করিয়া, উত্তরকালে (১১৪৩ সনে) মামুদ সা বা সাকুলী খাঁ নামিক মোহর দস্তখত্তি এক সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই গণপাড়া পল্লীতে পুণ্ডরীকাক্ষ ভট্টাচার্য্য নিজ প্রতিভাবলে বিদ্যাসাগর উপাধি লাভ করিয়া-

---

সুতরাং রামচন্দ্রকে বধ করিলেও প্রতাপাদিত্য তখন তাঁহার রাজ্য নিতে পারিতেন না; মাত্র আপন দুহিতাকে বৈধব্যানলে নিঃক্ষেপ করিতে পারিতেন। বঙ্গীয় বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ ছেলেন, ইতর লোকেও ইহা করে না। এইরূপ কিম্বদন্তীর মূলে আদৌ কোন সত্য নিহিত নাই। ঐ ঘটনা বিবাহের অনেক পরে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা এই পুস্তিকার যথাস্থানে লইব।

লেখক।

ছিলেন। ইনি একজন কলাপ ব্যাকরণের টীকাকার। ক্রমে ইঁহার বংশে কৃষ্ণনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, মদনমোহন ভট্টাচার্য্য, হরিনাথ তর্কপঞ্চানন, রঘুনাথ সিদ্ধান্ত প্রভৃতি পণ্ডিতগণ জন্মগ্রহণ করেন। বর্ত্তমানে এই বংশে দুইজন প্রৌঢ় ব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন।

ঢেউরিয়া পল্লী—এই পল্লীতে প্রথম শ্রীকর আচার্য্য নামক জনৈক ব্রাহ্মণ রাজা রামচন্দ্র রায়ের সময় আসিয়া বাস করিতে থাকেন। তাঁহাদের বংশানুসারে কতিপয় প্রৌঢ় ব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন। তৎকালীন দক্ষিণ কাশীপুরে রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহাদের বাড়ী সংস্কৃত চতুষ্পাঠী ছিল। তদ্ব্যতীত চব্বিশ পরগণার এড়েদহ হইতে দৈবকীনন্দন মুখোপাধ্যায় নামক জনৈক কুলীন ব্রাহ্মণ কাশীপুরে আসিয়া বাস করেন। ইঁহার পুত্র হরিহর, তৎপুত্র কৃষ্ণদেব তর্কালঙ্কার; তৎপুত্র রামরাম তর্কসিদ্ধান্ত, রঘুরাম ন্যায়ালঙ্কার এবং লক্ষ্মণচন্দ্র তর্কভূষণ, ইঁহারা প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। ইঁহারা পিতামহের প্রাপ্ত রাজদত্ত নিষ্কর বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কাশীপুরে সুখ্যাতির সহিত বসতি করিতেছেন। লাখুটীয়ার স্বর্গীয় রাজচন্দ্র রায় মহাশয় এই বংশের শিষ্য ছিলেন। ইঁহাদের চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকারে প্রাপ্ত ব্রহ্মত্রের বার্ষিক আয় অন্যূন ১৫০০দেড় হাজার টাকা। বর্ত্তমানে এই বংশে দুইজন প্রৌঢ় ও দুইটী যুবক বর্ত্তমান আছে।

কায়স্থ—গুহ মুসরিফ বংশের রাঘবেন্দ্র গুহ তৎকালীন কতক মহোত্তরাণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া, বংশপরম্পরায় কাশীপুরে বসতি করিয়া আসিতেছেন। দত্তবংশে কৃষ্ণানন্দ দত্তের রামকান্ত, কাশীনাথ, রঘুদেব নামে কতিপয় পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। চন্দ্রদ্বীপ রাজানুগ্রহে ইঁহাদের যে সকল ভূসম্পত্তি ছিল, তন্মধ্যে বাখরগঞ্জ কালেক্টরীর তৌজী ১৭৬৮নং

খারিজা তালুক রামমোহন দত্ত অন্যতম। উক্ত রামমোহন দত্তের পুত্র কালিদাস দত্ত বিক্রমপুর বিবাহ করিয়া শ্বশুরালয় বাস করিতে থাকেন। উক্ত কালিদাস দত্তের পৌত্র বর্ত্তমানে পেন্সনপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট রায় চন্দ্রকুমার দত্ত বাহাদুর। নাগবংশের জিতামিত্র নাগ নামিক জনৈক ব্যক্তি আসিয়া প্রথমে কড়াপুর বাসস্থান নির্দ্দেশ করেন এবং রাজবাড়ী কন্যা সম্প্রদান করিয়া চন্দ্রদ্বীপ কায়স্থ সমাজে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন। ঘোষবংশে—পঞ্চানন্দ ঘোষ রায়পাশাতে আসিয়া বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া বংশপরম্পরায় বসতি করিতেছেন।

দুর্গ ও গড় নির্ম্মাণ।

রাজা রামচন্দ্রের পিতা রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে চন্দ্রদ্বীপ রক্ষা করিবার জন্য বঙ্গোপসাগর সঙ্গমে রাবণাবাদে এক প্রকাণ্ড দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। হোসেনপুরের দুর্গ সম্বন্ধে পুর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

কাঠের বেড়াদ্বারা গড় নির্ম্মাণ।

বরিশাল নদী ও মাধবপাশা রাজধানী ইহার ঠিক্ মধ্যস্থলে কাশীপুরে কাঠ নির্ম্মিত বেড়াদ্বারা একটী গড় তৈয়ার করা হইয়াছিল, তন্মধ্যে পাটনা দেশীয় বক্সারী সৈন্যগণ বাস করিত এবং নিকটবর্ত্তী প্রকাণ্ড মাঠে ইহারা কুচ কাওয়াজ করিত। কাশীপুরে যে পল্লীতে উক্ত সৈন্যাবাস ছিল, তাহাকে অদ্যাপি কাঠগড় বলে। রাজা উদয়নারায়ণ রায়ের সময় এই পল্লীতে মহামায়া নামে এক বিগ্রহ স্থাপন করা হয়।

সৈন্যবল বৃদ্ধি।

রাজা রামচন্দ্র ও তৎপুত্র কীর্ত্তিনারায়ণের সময় প্রভূত সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। পঞ্জাব—উত্তর পশ্চিম প্রদেশ এবং পাটনা হইতে বহুতর সিপাহী ও বক্সারী সৈন্য আমদানী করা হয়। এতদ্ব্যতীত পর্টুগীজ সৈন্য সংখ্যাও অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করা হয়। জন্‌গেরী নামে জনৈক পর্টুগীজ দলপতি তৎকালে দশ সহস্রাধিক সৈন্যসহ বঙ্গদেশে বাস করিতেছিলেন; রাজা রামচন্দ্রের আহ্বানে তিনি তাঁহার দলবলসহ চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকারে কার্য্যে নিযুক্ত হন। * তৎকালে অশ্বারোহী, পদাতিক, পর্টুগীজ প্রভৃতি সমস্ত সৈন্য সংখ্যা একত্র করিলে রাজা রামচন্দ্রের লক্ষাধিক সৈন্য হইত।

বক্সারী সৈন্য।

রাজা রামচন্দ্র পাটনা, মজঃফরপুর, ত্রিহুত প্রভৃতি স্থান হইতে বহু সংখ্যক ছত্রি জাতীয় লোক আনিয়া সৈন্যদল গঠন করেন। কাশীপুর নথুল্লাবাদ পল্লীর নিকট ইহাদের ৩৬০ খানা বাড়ী ছিল। ক্রমে ইহাদের

* A large number of partu guese dwell in freedom at the ports on this cost of Bengal; they are also very free in their lives being like exiles. They do only traffic, without any fort, order, or police, and live like natives of the country they drust not return do India, for certain misdeeds they have committed, and they have no clergy among them. There is one of them named Jean Garie, who is greatly obeyed by the rest; be commands more than ten-thousand men for the king of Bengal.

The voyage of pyrard De Laval P. 334 Vol 1,

অধিকাংশ এদেশে রহিয়া গিয়াছে, অবশিষ্ট কতক দেশে গিয়াছে। বর্ত্তমানে মাধবপাশা (শ্রীনগরের) দক্ষিণদিকে হাদিবসকাঠী এবং কালীজিড়ায় ইহাদের বংশধরগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং কাশীপুরেও কতক বর্ত্তমান আছে।

অসভ্য শ্রেণীর সৈন্য।

এই রাজার সময় কতক পাহাড় অঞ্চলের সৈন্য ছিল। ইহারা প্রায়শঃ পদাতিক সৈন্যের কাজ করিত এবং সময় সময় তীর ধনু ব্যবহার করিতে জানিত। বর্ত্তমান কাশীপুর জঙ্গলের ফাগু সিং, কাঞ্চন সিং, বীর সিং বুনুয়াগণ সম্ভবতঃ তাহাদের বংশধর; ইহারা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু ও শ্রমশীল।

বাঙ্গালী সৈন্য।

রঘুনন্দন ফৌজদার নামে বিখ্যাত বাঙ্গালী বীর রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের একজন প্রধান সেনাপতি ছিলেন, ইহার অধীনে বহু সৈন্য থাকিত। ইহার চারি পুত্র। (১) লক্ষ্মীনারায়ণ, (২) রামনাথ, (৩) রঘুনাথ, (৪) রামমোহন। রঘুনন্দনের মৃত্যুর পর তাহার বলশালী পুত্রগণও চন্দ্রদ্বীপ রাজ সরকারে সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হন। রামনাথের বংশধরগণ হোসেনপুরের নিকট শিমুলেশ্বর বা শিমুলিয়া গ্রামে বাস করেন এবং রামমোহনের পুত্র রামরাজা সিংহ কাশীপুরের চহঠা পল্লীতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় বসতি করিতে থাকেন। তাহার দুই পুত্র রামশেখর ও রামকিশোর। রামকিশোর নিঃসন্তান, বর্ত্তমানে তাহার দৌহিত্র কুশঙ্গল নিবাসী বাবু শ্যামাচরণ দত্ত বি, এল, বরিশালে ওকালতী করিতেছেন। রামশেখরের বংশে বর্ত্তমানে শশিভূষণ ও জানকীভূষণ নামে কতিপয় যুবক আছেন।

তন্মধ্যে শশিভূষণ সিংহ গ্রাজুয়েট এবং জানকিভূষণ সিংহ এসিষ্টাণ্ট সেটেলমেণ্ট অফিসার।

বর্ত্তমান মুলাদী ষ্টেসনাধীন ইচালী গ্রামে যে দত্ত চৌধুরী বংশ বিদ্যমান আছে, ইহাদের পূর্ব্বপুরুষ রামেশ্বর দত্ত একজন বাঙ্গালী সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন এবং চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকারে ইহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। রাজার অনুগ্রহে ইহারা যে ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাই বর্ত্তমানে আজিমপুর পরগণায় রাজারাম দত্ত চৌধুরী নামিক ১নং জমিদারী। ইহা ব্যতীত ১৯৮৩নং জিরান্দী জাহাপুর নামে ইহাদের আর একটী জমিদারী আছে, তাহা প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে; যথা— এই বংশীয় রামেশ্বরের সহযোগী অপর এক যোদ্ধৃবীর ভগবান্ দত্ত ঢাকার নিকটস্থ মজিদবাড়ী নামক স্থানে শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ করতঃ ঐ যুদ্ধে জয় লাভ করিয়া জাহাপুর নদীর পাড়ে সসৈন্যে বিশ্রাম করেন * (জিড়ান) চন্দ্রদ্বীপ-রাজ ঐ যুদ্ধ জয়লাভে সন্তুষ্ট হইয়া, উক্ত বাঙ্গালী বীরকে ঐ চরভূমি ও তৎসংলগ্ন কতিপয় ভূমি দান করেন। ইহাই উত্তরকালে ১৯৮৩নং জমিদারীর সৃষ্টি হইয়াছিল; এই জমিদারী জাহাপুর পরগণার অন্তর্গত। অদ্যাপি এই বংশীয় ব্যক্তিগণের বিবাহকালীন তলোয়ার ব্যবহার করা এবং ঘোড়ার চড়ার রীতি আছে। বর্ত্তমানে এই বংশে কালীপ্রসন্ন দত্ত চৌধুরী প্রভৃতি নামে কতিপয় যুবক বর্ত্তমান আছে।

কামান।

রাজা রামচন্দ্রের সময় যে দুইদল পর্টুগীজ সৈন্য ছিল। তাহারা যেমন শিক্ষা দিয়া সৈন্যদল গঠন করিত, পক্ষান্তরে বন্দুক, কামান, গোলা গুলী

* বিশ্রাম শব্দ পূর্ব্বকালে "জিড়ান" শব্দে ব্যবহৃত হইত।

প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণ নির্ম্মাণ করিত। এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালী বীর মদন সিংহের কর্ত্তৃত্বাধীনে ভিন্নভাবে দেশীয় লোকদ্বারাও কামান, বন্দুক তৈয়ার করা হইত। রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের সময়ে সম্ভবতঃ উজিরপুরে কামান তৈয়ার হইত; মাত্র ১৫।১৬ বৎসর অতীত হইল, মাধবপাশা রাজবাড়ীতে দুইটী কামান পাওয়া গিয়াছিল। তাহার একটীর উপর ৩১৮ অঙ্ক এবং কন্দর্প-নারায়ণ রায়ের নাম খোদা ছিল এবং অপর কামানটীর উপরে "গোবিন্দচন্দ্র কর্ম্মকার" কৃত এই কথা খোদিত ছিল। উক্ত কামান দুটী পরলোকগত সাহিত্য-সেবী স্বর্গীয় রোহিণীকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় বিবাহ উপলক্ষে কীর্ত্তিপাশা গ্রামে নিয়াছিলেন। কতিপয় অশিক্ষিত লোক উক্ত কামানের ভিতর ইষ্টকখণ্ড ও বারুদ বোঝাই করিয়া আগুন্ দিয়াছিল, তাহাতে একটী কামান ভীষণ গর্জ্জন করিয়া ফাটিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছিল। অপরটী কিছুদিন বরিশাল পোলিশকোর্টের নিকট পড়িয়াছিল। বর্ত্তমানে উহার একটী কামান অত্রত্য সহৃদয় মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর বরিশাল সাহিত্য পরিষদ্ শাখায় দান করিয়াছেন বলিয়া শুনা যাইতেছে। উক্ত রাজবাড়ীতে এক পুষ্করিণী আছে, তাহাকে কামানতলা বলে; বোধহয় সেখানে অনেক কামান থাকিত। মাধবপাশা হইতে এক রাস্তা পূর্ব্বকালে কাগাশুড়া, মুকুন্দপাট্টি ও মতাসারের মধ্যদিয়া তৎসম্মুখবর্ত্তী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; তথায় মাটিয়া বুরুজ অদ্যাপি এমন উচ্চভাবে স্তূপ আছে, দেখিলে বোধহয় ঐ স্থানে কামান দাগান হইত।

রামমোহন মাল।

রামমোহন মাল সম্বন্ধে যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে ইহার পৈতৃক নিবাস বর্ত্তমান উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ছিল (North west provinces)

ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয় ছিলেন। ইহার পিতা ঘটনাচক্রে পূর্ব্ববঙ্গের ভুলুয়া (নোয়াখালী) প্রদেশের শিঙ্গারগাও গ্রামে বসতি করেন। বাল্যকালে রামমোহন অত্যন্ত ঔদ্ধত্য প্রকৃতির যুবক ছিলেন। কৈশোরেই ইহার বলিষ্ঠ চেহারা দেখিয়া প্রবীণ ব্যক্তিগণ বলিয়াছিলেন, রামমোহন পরিণত বয়সে একজন খ্যাতনামা যোদ্ধা হইতে পারিবেন। ক্রমে রাম-মোহনের শারীরিক শক্তি সম্বন্ধে চন্দ্রদ্বীপ-রাজের কর্ণগোচর হইলে, রাজার আহ্বানে রামমোহন আসিয়া চন্দ্রদ্বীপ-রাজ কন্দর্পনারায়ণ রায়ের শেষ জীবনে তাঁহার শরীররক্ষক পদে নিযুক্ত হন। বিশারীকাঠী (ঝিশিন্দা) হইতে কন্দর্পনারায়ণ রায় ক্ষুদ্রকাঠীতে আগমন করিলে বরিশালের নিকট-বর্ত্তী জগদ্দল গ্রামে রামমোহনের বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। পরে তথাহইতে ক্ষুদ্রকাঠীর নিকট রাকুদিয়া গ্রামে তাহার বাসস্থান পরিবর্ত্তন করা হয়। তৎপর রামমোহনের পুত্র প্রাণকৃষ্ণের অভিপ্রায় মতে ইহারা রাকুদিয়া গ্রামের সংলগ্ন পশ্চিমাংশে উজির খাঁ নামক জনৈক মুসলমান সরদারকে সদলবলে নিহত করিয়া, উজিরপুর নামক স্থানে স্থায়ী বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া লয়। রাজা রামচন্দ্র রামমোহনকে এত ভালবাসিতেন যে, তাহার বংশস্থ ব্যক্তিগণকে মীরবহর উপাধিতে ভুষিত করেন এবং চন্দ্রদ্বীপ হইতে প্রভূত ভূসম্পত্তি দান করেন, উহাই রামমোহনের বংশধর রত্নেশ্বরের নামানুসারে রত্নদী-কালিকাপুর নামে একটী পরগণা হইয়াছে, ইহা সামান্য জমিদারী নহে। বর্ত্তমানে এই পরগণায় ছয়খানি খারিজা তালুক সমেত গবর্ণমেণ্ট রাজস্বের পরিমাণ ২৮৫৫১৸১০ পাই। এই পরগণার ভূমিগুলি ৭২টি মৌজায় বিভক্ত। কামান ছুড়িতে এবং মল্লযুদ্ধ ও অসি চালনায় রামমোহন বিশেষ দক্ষ ছিলেন; ইহা ব্যতীত প্রভুভক্ত ও বিশ্বস্ততা ইহার

অন্যতম গুণ ছিল। রামমোহনের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ ও জীবনকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের পুত্র রত্নেশ্বর এবং জীবনকৃষ্ণের পুত্র নরোত্তম। রত্নেশ্বরের চারিপুত্র—(১) কৃষ্ণরাম, (২) কন্দর্পরাম, (৩) কীর্ত্তিচাঁদ, (৪) রামকিশোর রায়। এই বংশের বাবু অখিলচন্দ্র রায় বরিশাল খাসমহলের ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন; এক্ষণ পেন্সন্ ভোগ করিতেছেন। ইঁহার একমাত্র পুত্র সতীশচন্দ্র রায়। এই বংশে রসিকচন্দ্র, স্বর্ণকুমার রায় প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি বর্ত্তমান আছেন। উক্ত জমিদারী নীলাম হওয়ায় রামচন্দ্রপুরের গুহপরিবার ঐ পরগণার অধিকাংশ অংশ ক্রয় করিয়া ভোগ করিতেছেন।

লক্ষ্মণমাণিক্যের পরিচয়।

বর্ত্তমান নোয়াখালী জিলা বা ভুলুয়া প্রদেশ অতীতের অদূরবর্ত্তীকালে বঙ্গোপসাগরের অংশ ছিল। এক সময় সে স্থানে ভীষণ ঊর্ম্মিমালা উত্থিত হইয়া মানবের ভীতি সঞ্চার করিত। ফেণী নদীর পশ্চিম, মেঘনা নদীর পূর্ব্ব, ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত মেহারের দক্ষিণ, এই বিস্তীর্ণ ভূভাগই ভুলুয়া দেশ নামে বিখ্যাত। এই প্রদেশের অধিপতিগণ মধ্যে রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম নরপতি ছিলেন; ইঁহারা শূরবংশীয় কায়স্থ। এই বংশ ভুলুয়া আগমন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রবাদ প্রচলিত আছে; যথা—আদিশূরের বংশসম্ভূত বিশ্বম্ভর শূর চন্দ্রনাথতীর্থ দর্শন করিবার বাসনায় অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া, বঙ্গীয় ৬১০ সালে চন্দ্রনাথতীর্থে উপনীত হয়েন। স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় আকাশ ঘন কুয়াসাচ্ছন্ন থাকায় নাবিকগণের দিগ্‌ভ্রম হয় এবং সাতদিন পরে অর্ণবপোতখানি বঙ্গোপসাগরের উপকূল সমীপে একটী চরের নিকট উপনীত হয়। তখন নিদ্রাবস্থায় বিশ্বম্ভর

শূর স্বপ্ন দেখেন যে, ৺ বারাহী দেবী তাঁহাকে বলিতেছেন—"আমি তোমার অর্ণবপোতের দক্ষিণপার্শ্বে আছি, তুমি আমাকে উত্তোলন করিয়া পূজা কর। এই যে ক্ষুদ্র চর দেখিতেছ, অবিলম্বে ইহা প্রকাণ্ড দ্বীপের আকার ধারণ করিয়া মানবলোচনের গোচরীভূত হইয়া, মনুষ্যের আবাসভূমি হইবে এবং তোমার বংশধরগণ ইহাতে সপ্তমপুরুষ পর্যান্ত নিরাপদে রাজত্ব করিবে। তৎপর পঞ্চদশপুরুষ পর্য্যন্ত হীনভাবে রাজত্ব করিবে।"

বিশ্বাম্ভর শূর স্বপ্নাদেশ অনুসারে অর্ণবযানের দক্ষিণাংশ অনুসন্ধান করিয়া ৺ বারাহী দেবীর শক্তিমূর্ত্তি প্রাপ্ত হইলেন এবং কুয়াসার মধ্যে পূর্ব্বমুখী স্থাপন করিয়া সময়োপযোগী উপকরণদ্বারা তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন। কুয়াসান্তে সূর্য্যকিরণে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত হইলে দেখা গেল যে, পশ্চিমমুখী হইয়া ৺ বারাহী দেবীকে অর্চ্চনা করা হইয়াছে। সুতরাং সকলে বলিয়া উঠিল "ভুল হুয়া" এই শব্দ হইতে ঐ প্রদেশ উত্তরকালে ভুলুয়া নামে অভিহিত হইয়াছে।

৺ বারাহী দেবীর স্বপ্নাদেশ মতে বিশ্বাম্ভর শূর উক্ত ভুলুয়া প্রদেশে রাজধানী স্থাপন করিয়া, রাজধানীকে কল্যাণপুরী নামে অভিহিত করেন। বর্ত্তমানে কল্যাণপুরী হইতেই কল্যাণপুর হইয়াছে। তিনি বিক্রমপুর ও চন্দ্রদ্বীপ হইতে কতিপয় ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনয়ন করিয়া ভুলুয়া প্রদেশে বসতি করান। কালক্রমে তাঁহার চেষ্টায় জঙ্গলাকীর্ণ চর সুশোভন মানব নিকেতনরূপে পরিণত করা হয়। এই বিশ্বাম্ভর ভুলুয়ার প্রথম রাজা। বিশ্বাম্ভরের পুত্র গণপতি, তৎপুত্র শূরানন্দ, তৎপুত্র দেবানন্দ, তৎপুত্র মাধবচন্দ্র, তৎপুত্র রাজা রাজবল্লভ; এই রাজা রাজবল্লভের পুত্র রাজা লক্ষণমাণিক্য। রাজা রাজবল্লভ আরকানের মগের আক্রমণ সহ্য করিতে

অসমর্থ হইয়া, যোগদিয়া ও দাদড়া নামক জনপদ জনৈক দুর্দ্দান্ত মুসলমান ও জনৈক হিন্দু সেনাপতিকে প্রদান করেন। পরে তাহাদের সাহায্যে রাজা রাজবল্লভ মগদিগের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করেন।

রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য একজন অসাধারণ বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি সংগ্রামকালে যে কবচ পরিধান করিতেন, তাহা কল্যাণপুর রাজবাটীতে রক্ষিত আছে; এই কবচের ওজন ন্যূনাধিক একমণ। লক্ষ্মণমাণিক্যের সহিত চন্দ্রদ্বীপ-রাজ কন্দর্পনারায়ণ রায়ের মধ্যে মধ্যে সীমানা দিয়া বল পরীক্ষা হইত। তৎপর নিম্নলিখিত কারণে রাজা রামচন্দ্রের সহিত তাঁহার মনোমালিন্য উপস্থিত হয় এবং সেই মনোমালিন্যের ফলে যে যুদ্ধ হয়, তাহাই লক্ষ্মণমাণিক্যের চির-নিদ্রার কারণ হইয়াছিল।

দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্যের বিবরণ।

শ্রীহট্ট প্রদেশ হইতে জনৈক তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ ভুলুয়ার নিকটবর্ত্তী মেহারের কালীবাড়ীতে আসিয়া বাস করেন। কালক্রমে তাঁহার অসাধারণ শক্তির কথা ভুলুয়া-রাজ অবগত হইয়া, ভুলুয়ার অন্তর্গত বর্ত্তমান বাবুপুর নামক স্থানে তাঁহাকে বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া লক্ষ্মণমাণিক্য নির্জ্জে

* নোয়াখালী ইতিহাস লেখক বলেন—তিনি জনশ্রুতি শুনিয়াছেন, লক্ষ্মণমাণিক্য চন্দ্রদ্বীপে দুইবার বিজয় পতাকা উড্ডীন করিলে রাজা রামচন্দ্র ভুলুয়া গিয়া তাঁহার সহিত ভালবাসা করিয়া, কোন নৌকায় জলখেলা করিতে যান এবং রামচন্দ্রের ইঙ্গিতে রাম-মোহন মাল নৌকা ডুবিয়া নিরস্ত্র লক্ষ্মণকে বন্দী করেন। এই কিম্বদন্তী বা জনশ্রুতি সর্বৈব মিথ্যা; ইহার মূলে অণুমাত্র কোন সত্য নিহিত নাই। ইতিহাস লেখক জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া রামচন্দ্রকে "পামর" বলিতেও বিমুখ হন নাই, ইহা বড়ই দুঃখের

তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ক্রমে তথায় তাঁহার তিনটী পুত্র হয়। কিছু-কাল পরে তিনি চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত শিকারপুরের নাসিকাপীঠ দর্শন মানসে আগমন করিলে তাঁহার অলৌকিক শক্তির কথা ক্রমে চন্দ্রদ্বীপ-রাজের কর্ণ-গোচর হয়। তৎপর রাজা উক্ত তান্ত্রিক ভট্টাচার্য্যের সহিত দেখা করিয়া— "তিনি এতদ্দেশে বাস করিলে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন" এইরূপ অঙ্গীকার করেন। তৎপর ঐ ভট্টাচার্য্য এ দেশে বাস করিতে স্বীকার হইলে রাজা তাঁহাকে খাপুরাগ্রামে বসতি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন এবং ঐ ইষ্টদেবের জন্য মালাকর, কুম্ভকার প্রভৃতি নানাবিধ জাতিতে খাপুরা গ্রামখানি সমৃদ্ধিশালী গ্রামে পরিণত করেন। উক্ত ভট্টাচার্য্যের জনৈক পুত্র উজির-পুরের নিকটবর্ত্তী মুলপাইন নামক এক গণ্ডগ্রামে পাকরত্তা উপাধিবিশিষ্ট জনৈক ব্রাহ্মণ তনয়ার পাণিগ্রহণ করেন। ইহারা দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্য নামে প্রসিদ্ধ। এই বংশে উজিরপুর নিবাসী স্বর্গীয় তারাপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন একজন স্মৃতিশাস্ত্রের লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। বর্ত্তমানে তাঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য্য ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপক পদে নিযুক্ত আছেন। এই বংশে ভুলুয়া পরগণায় বাবুপুর গ্রামে তারিণীশঙ্কর, হরিশঙ্কর, উমাশঙ্কর ভট্টাচার্য্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত চিলেন। বর্ত্তমানে বাবুপুরে কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য বাস করিতেছেন। চন্দ্রদ্বীপে ইহাদের বহু শিষ্য বিদ্যমান আছে। চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের বসুবংশ দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। মিত্রবংশে

বিষয়; নোয়াখালীর ইতিহাস লেখক এক জনশ্রুতির প্রসঙ্গ করেন, লক্ষ্মণমাণিক্যের সহ রামচন্দ্রের ঐরূপ সখ্যতাব করা অসম্ভব ছিল; কারণ তৎকালীন রামচন্দ্র কৈশোর অতিক্রম করিয়া পূর্ণ যৌবনেও পদার্পণ করেন নাই; কিন্তু তখন লক্ষ্মণমাণিক্য অতি বয়োবৃদ্ধ ছিলেন।

রাজাদের গুরু ঢাকা সুলতানাবাদ পরগণার অন্তর্গত মিতারায় ভট্টাচার্য্যগণ, এবং রাণীদের গুরু অদ্যাপি ভুলুয়ার দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্যবংশ।

ভুলুয়াই লুটের বিবরণ।

চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অধীন বর্ত্তমান বরিশাল থানার অন্তর্গত থাপুরা নামক গ্রামে দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্যবংশে সর্ব্ববিদ্যার সন্তান ও কতিপয় কুলীন কায়স্থ এবং অন্যান্য নবশাখ শ্রেণীর লোকসমূহ বসতি করিত। চন্দ্রদ্বীপ অধীশ্বর রামচন্দ্র রায় রাজা হওয়ার পর একদা ভুলুয়া-রাজ লক্ষ্মণমাণিক্য প্রায় পাঁচ সহস্র সৈন্য ও লোকজন প্রেরণ করিয়া গভীর নিশীথে তৎকালীন বর্ত্তমান জাহাপুর নদীর পাড়স্থ থাপুরা গ্রাম ঘেরাও করিয়া, তথাকার সর্ব্ববিদ্যার সন্তান ভট্টাচার্য্যবংশীয় ব্রাহ্মণ এবং ঐ গ্রামস্থ তাবৎ লোকগুলিকে তাহাদের বাড়ী ঘর সমেত নিয়া গিয়া ভুলুয়া প্রদেশে তাহাদিগকে বসতি করান। তদবধি ঐ সকল লোক ভুলুয়াতেই বসতি করিতেছেন। হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে একখানি গ্রাম জন-মানবশূন্য হওয়ায় পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামিকগণ ভীত ও ত্রাসিত হইয়া, এই অভিনব লুটের বৃত্তান্ত রাজা রামচন্দ্রের কর্ণগোচর

* চন্দ্রদ্বীপের ন্যায় ভুলুয়া প্রদেশও বহু পরগণায় বিভক্ত হইয়াছে; যথা—বোগদিয়া বাবুপুর, গোপালপুর, অমরাবাদ, জয়নগর, সায়েস্তাবাদ, বেদারাবাদ, আমিরাবাদ, রোশনাবাদ, ইহা ব্যতীত নিজ ভুলুয়াও একটী বিস্তৃত পরগণা। ভুলুয়া জমিদারী নীলাম হইলে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ গঙ্গাগোবিন্দসিংহের বংশধর লালা বাবুর স্ত্রী রাণী কাত্যায়নী খরিদ করেন। বর্ত্তমানে ইহার স্বত্বাধিকারিগণ গিরিশচন্দ্র সিংহ, পূর্ণচন্দ্র সিংহ, কার্ত্তিকচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি। ভুলুয়ার জমিদারগণ প্রধানতঃ নাইখালী, রাজগাড়া, বাবুপুর ও কাদিরপাড়া গ্রামে বসতি করিতেছেন। বর্ত্তমানে রাণী শরীয়ৎশীর অপদস্থ হইয়া ৮ মহারাণী প্রেমী ..... পতিত হইয়াছেন।

করিলেন। রাজা রোষে ও ক্ষোভে সমধিক উত্তেজিত হইয়া, অবিলম্বে ইহার প্রতিশোধ দিতে মনস্থ করিলেন। বহুদিন হইতে এ জিলার আবাল, বৃদ্ধ সকলেই ঐ লুটের বৃত্তান্ত উপলক্ষ করিয়া কথাচ্ছলে "ভুলুয়াই লুটের" কথা বলিয়া থাকে।

লক্ষ্মণমাণিক্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা।

বালুয়াগ্রাম হইতে রাজার ইষ্টদেব সর্ব্ববিদ্যার সন্তান দিগ্বিজয় ভট্টাচার্য্যকে এবং অন্যান্য গ্রামিকগণ সহ লুটিয়া নেওয়ায়, রাজা রামচন্দ্র উক্ত ইষ্টদেবকে সপরিবার পুনঃ প্রত্যার্পণের জন্য রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের নিকট এক চিঠিসহ দূত প্রেরণ করেন। ভুলুয়ারাজ লক্ষ্মণমাণিক্য দূত মারফতে চিঠি পাইয়া, অহঙ্কারে বক্ষঃ-স্ফীত করিয়া এইরূপ উত্তর দেন যে, "বালক রাজার এত স্পর্দ্ধা ভাল নহে।" রাজা রামচন্দ্র এই চিঠি পাইয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে অধীর হইলেন এবং রাজসভায় বলিলেন যে, অবিলম্বে বালক রাজার বল-বিক্রম লক্ষ্মণমাণিক্যকে দেখাইতে হইবে। সুতরাং রামমোহন মাল, রামেশ্বর দত্ত, ভগবান দাস, মদনসিং, নানাফর্ণাণ্ডিজ ও জন্‌গেরীকে রণসজ্জা করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। বড় বড় রণপোত গুলিতে কামানরাজি স্থাপিত হইল এবং তাঁহার পাঁচদল সৈন্য মধ্যে একদল মাত্র রাজধানীতে রাখিয়া, দুইদল পর্টু-গীজ সৈন্য এবং একদল বক্সারী সৈন্য ও একদল বাঙ্গালী সৈন্য সমভিব্যাহারে কালীজিড়া নদী হইতে রওনা হইয়া, কতিপয় দিবস পরে লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজধানীর সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং তথায় শিবির সংস্থাপন করিলেন। রাজা রামচন্দ্র রোষে ও ক্ষোভে স্বয়ং অধিনায়কের পদ গ্রহণ করতঃ সৈন্য সমাবেশ করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘাটী বসাইলেন এবং অস্ত্রসংক্রান্ত কাজ সৌর

হইলে লক্ষ্মণমাণিক্যকে আগমন-বার্ত্তা জ্ঞাপনার্থে মুহুর্মুহু তোপধ্বনি করিলেন। গভীর নিশীথে কামানের ভীষণ গর্জ্জনে লক্ষ্মণমাণিক্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি হঠাৎ শত্রুরাজি শিয়রে দর্শন করিয়া মনে মনে প্রমাদ গণিলেন, কিন্তু মৌখিক দাম্ভিকতায় পশ্চাৎপদ হইলেন না; অবিলম্বে আপন সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে রাজা রামচন্দ্র, সৈন্যগণসহ লক্ষ্মণমাণিক্যকে ঘোরতররূপে আক্রমণ করিলেন এবং রণবাদ্য ও কামান গর্জ্জনে প্রাচীন ভুলুয়াভূমি কম্পিত করিয়া তুলিলেন। উভয় পক্ষীয় বীরগণ অশ্রুতপূর্ব্ব ক্ষিপ্রকারিতাসহকারে আগ্নেয়াস্ত্রদ্বারা গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। সৈন্যগণের পদোত্থিত ধূলিপটলে আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল; যুদ্ধ-মদোন্মত্ত বীরগণ জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া, ঘোরতররূপে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাজা লক্ষ্মণমাণিক্য যুদ্ধ করিতে করিতে হঠাৎ রামচন্দ্রের চক্রব্যূহে প্রবেশ করিলেন। রাজা রামচন্দ্রের সৈন্যগণ চতুর্দ্দিক হইতে লক্ষ্মণমাণিক্যকে ঘেরিয়া ফেলিলেন। এদিকে লক্ষ্মণমাণিক্যের সৈন্যগণ ভুলুয়াধিপতিকে দেখিতে না পাইয়া তিনি বিনষ্ট হইয়াছেন মনে করিয়া চতুর্দ্দিকে ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। বীরাগ্রগণ্য রামমোহন মাল অবিলম্বে লক্ষ্মণমাণিক্যকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং লৌহশৃঙ্খলে বন্ধন করতঃ লৌহপিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া, রাজা রামচন্দ্রের নৌকায় লইয়া গেলেন। অবিলম্বে লক্ষ্মণমাণিক্যের পরাজয় এবং রাজা রামচন্দ্রের বিজয়বার্ত্তা ঘোষিত হইল। রাজা রামচন্দ্র কালবিলম্ব না করিয়া মদন সিং ও ফর্ণাণ্ডিজের হস্তে সৈন্যগণের আগমন বন্দোবস্তের ভারার্পণ করিয়া, রামেশ্বর ও ভগবানকে সহ আপন রণতরী চন্দ্রদ্বীপাভিমুখে রওনা করিয়া দিলেন এবং কয়েকদিনের মধ্যে মাধবপাশায় আসিয়া উপনীত হই-

লেন। লক্ষ্মণমাণিক্যের পরাজয় ও বন্দীর দিন হইতে ভুলুয়া রাজ্য কিছুদিন চন্দ্রদ্বীপের অধীন হইয়া রহিল এবং তখন হইতে ভুলুয়ার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির সহিত চন্দ্রদ্বীপ অধিবাসীর ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল এবং ভুলুয়াতে লক্ষ্মণমাণিক্যের স্বাধীনতা-সূর্য্য কিছুদিনের জন্য অস্তমিত হইল।

লক্ষ্মণমাণিক্যের মৃত্যু।

ভুলুয়া হইতে কর্ণাণ্ডিজ, জন্গেরী ও মদন সিং আসিবার কয়েক দিন পরে লক্ষ্মণমাণিক্যের বিচার হয় এবং সামরিক বিচারে রাজা রামচন্দ্র তাঁহাকে ফাঁসীর আদেশ করেন। কোমলহৃদয়া রাজমাতা রাজধানীতে ফাঁসী হইবে শুনিয়া লক্ষ্মণমাণিক্যকে বধ করিতে নিষেধ করেন। রামচন্দ্র মাতৃ আজ্ঞা প্রাণান্তেও লঙ্ঘন করিতেন না; সুতরাং লক্ষ্মণমাণিক্যের ফাঁসির হুকুম প্রত্যাহার করা হইল। বহুদিন পর্য্যন্ত লক্ষ্মণমাণিক্য কারাগারে বন্দী ছিলেন; একদিন রাজা স্নানার্থ তৈল মাখিতেছেন, এমন সময় তাঁহার আজ্ঞার অনুরোধে ভীমকায় মহাবল লক্ষ্মণমাণিক্যকে তথায় আনয়ন করা হইল। রাজা নানাবিধ কথোপকথন করিতেছিলেন, লক্ষ্মণমাণিক্য একটা নারিকেল বৃক্ষের সহিত হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রমিক লক্ষ্মণ মাণিক্য নারিকেল গাছটাকে দোলাইতে দোলাইতে রাজা রামচন্দ্রের সম্মুখে বিকট শব্দে ফেলিয়া দিলেন। লক্ষ্মণের মনোগত অভিপ্রায় ছিল, নারিকেল বৃক্ষ ফেলিয়া বৈর নির্য্যাতন করিবেন; কিন্তু তাহা রামচন্দ্রের গায় না পড়িয়া তাঁহার এক পার্শ্বে পড়িল, দৈবাৎ রাজা রক্ষা পাইলেন। ইহা দেখিয়া রাজমাতা তৎক্ষণাৎ এবম্বিধ দুর্দ্দান্ত বীরকে বধ করিতে আদেশ দিলেন এবং অবিলম্বে ঘাতকের হস্তে শৃঙ্খলাবদ্ধ লক্ষ্মণের ছিন্ন মস্তক ভূতলে পতিত হইল। তৎপর রাজা রাজোচিত নিয়মে লক্ষ্মণের সৎকার করাইলেন।

পরিব্রাজক বৃত্তান্ত।

১৫৯০ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এবং বাঙ্গালা ১০০৬ সালের আশ্বিন মাসে ফন্সীকা (Fonseca) নামক জনৈক পাদরী সাহেব যশোহর নগরে উপনীত হন। যশোহরে আসিবার অল্পদিন পূর্ব্বে ইঁনি চন্দ্রদ্বীপে রাজা রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। সে সময় রামচন্দ্রের বয়স ৮।৯ বৎসরের অধিক নহে, তিনি এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত পর্য্যটক আরও বলেন—রাজা রামচন্দ্র অল্পবয়স্ক হইলেও তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি সুতীক্ষ্ণ ছিল। ঐ সময় মহারাজ প্রতাপাদিত্যের ৬ষ্ঠ বর্ষীয়া কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহের কথা হইতেছিল, সম্ভবতঃ উহার ২।৩ বৎসর মধ্যেই উক্ত বিবাহ হইয়া থাকিবে।

রাজা রমচন্দ্রের পিতা রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের রাজত্বকালে র‍্যাফেল কিচ্ নামক জনৈক ইউরোপীয় পরিব্রাজক ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত ছিলেন; তিনি বলেন—শ্রীপুর হইতে আমি বাক্লা চন্দ্রদ্বীপে উপস্থিত হই। এ স্থানের রাজা হিন্দু; তিনি সৎপ্রকৃতির লোক, বন্দুক ছুড়িতে তিনি বড় ভালবাসেন, ইঁহার রাজ্য বৃহৎ ও উর্ব্বরা; এ প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে চাউল, তুলা ও রেশমের কাপড় উৎপন্ন হইয়া থাকে। এ স্থানের গৃহ সকল সুন্দর ও উন্নত, রাস্তা সকল প্রশস্ত, অধিবাসীরা নগ্নপ্রায় কেবলমাত্র কটিদেশ বস্ত্রখণ্ডদ্বারা আচ্ছাদিত রাখে। এ দেশের স্ত্রীলোকদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে রৌপ্য রক্ষিত হইয়া থাকে, তাঁহারা গলায়, হাতে ও পায়ে রৌপ্য এবং তাম্র ও হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করিয়া থাকে। অতি প্রাচীন বৈদেশিক মানচিত্রে বাক্লা চন্দ্রদ্বীপের নাম বড় অক্ষরে অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়।

সামাজিক বিধান।

রাজা রামচন্দ্রের সময় কায়স্থ সমাজে যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

(১) কুলীনের সকল সন্তানই পিতার তুল্য কুলীন গণ্য হয়েন।

(২) কুলীনের পোষ্য পুত্র কুলীন নহেন।

(৩) কুলীনের পোষ্য পুত্রকে যদি অপর কুলীন কন্যা দান করেন তাহাতে যে দোষ স্পর্শে তাহা শত কুলকার্য্যদ্বারাও খণ্ডন হয় না।

(৪) যে সকল কুলীন ক্রমাগত কুলীনের সহিত আদান-প্রদান করিয়া আসিতেছেন, তাহাদের কুল গঙ্গাক্রতকুল নামে খ্যাত।

(৫) কুলীনগণ পর্য্যায় অনুসারে আদান-প্রদান করিবেন, পর্য্যায় বিপর্য্যায় হইলে কুলভঙ্গ হয়।

(৬) যে সকল কুলীন স্বীয় পর্য্যায়ক্রমে পাত্র বা পাত্রী না হইবেন, কুলজ অথবা মধ্যল্য তাহার বিশ্রামস্থল। তাহারা উহাদের সহিত আদান-প্রদান করিতে পারেন। নিতান্ত মহাপাত্রদিগেরও সহিত আদান-প্রদান করিতে পারেন। যদি তাহাদের তিনপুরুষ পর্য্যন্ত কেহ কুলীনে কন্যা দান ও গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহাদের কুল বজায় থাকিবে।

(৭) কুলীনগণ যখন কুলীনদের সহিত আদান প্রদান করেন, তখন অবস্থানুসারে তাহাদের সেই কার্য্য "আদ্য" "উচিত" "গুহ্" "করি" এই চারিভাব হয়। যখন তাহারা কুলজের সহিত কার্য্য করেন, তখন তাহাদের সেই কার্য্য "উপ" ভাব লেখা যায়। যখন তাহারা মধ্যল্যের সহিত কার্য্য করেন তখন "কম" ভাব লিখিত হয়। যখন তাহারা মহাপাত্রের সহিত কার্য্য করেন, তখন তাহা "অপ"ভাব লেখা হয়। ছোট কুলীন যদি বড়

কুলীনের সহিত কার্য্য করেন, তাহাহইলে ছোট কুলীনের পক্ষে ঐ কার্য্যের "সৎ"ভাব হয়। কুলজ, মধ্যল্য ও মহাপাত্র ইহারা কুলীনের সহিত কার্য্য করিলে তাহাদের পক্ষে সেই কার্য্যের "সৎ" ভাব গণ্য হয়।

(৮) কুলীনগণ যদি তিনপুরুষের মধ্যে কুলীনের সহিত সংস্পর্ক না রাখিয়া পুরুষানুক্রমে অপ সম্বন্ধ করে, তাহা হইলে তাহারা কুলচ্যুত হইয়া হীন হয়েন। কুলীনগণ তাহাদিগের সহিত আদান-প্রদান করিলে তাহাদের সেই সম্বন্ধ অবস্থানুসারে কুলীনের পক্ষে অপ ও অত্যন্ত সম্বন্ধ বলিয়া পরি-গণিত হইতে পারে।

(৯) কুলীনের তিনপুরুষ পর্য্যন্ত যদি দৌহিত্র দোষ জন্মে, অর্থাৎ তিন পুরুষ মধ্যে যদি একপুরুষেরও মাতামহ কুলীন না হয়, তাহা হইলে কুলে দোষ স্পর্শ হয়।

চন্দ্রদ্বীপের সামাজিক সীমানা।

উত্তরে ঢাকা, দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, পশ্চিমে তেলিহাটী পরগণা। ইহার বাহিরে কোন কুলীন বাস করিলে, তাহার কুল থাকিবে না; তবে উক্তরূপ কুলভ্রষ্ট কুলীনগণ পুরুষানুক্রমে কুলীনগণ সহিত আদান-প্রদান বজায় রাখিলে তিনি কুলজ আখ্যাপ্রাপ্ত হইবেন।

ঘটক ও স্বর্ণমাত্য।

রাজা রামচন্দ্রের সময় ঘটক ও স্বর্ণামাত্য এই দুইটী পদের সৃষ্টি হয়। এই উভয়পদ ব্রাহ্মণজাতিকে অর্পণ করা হয় এবং এই জাতীয় ব্রাহ্মণগণ যাহারা ঘটকের কার্য্য করিতেন, তাহারা (১) কায়স্থদিগের বর্দ্ধনশীল বংশাবলী, (২) তাহাদের বিবাহের সংখ্যা, (৩) কে উৎকৃষ্ট বংশ কে নিকৃষ্ট বংশ, ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। আবশ্যক হইলে রাজসভায় উপস্থিত

থাকিয়া কায়স্থদিগের কুল-কার্য্যাদির বিবরণ বিশেষরূপে রাজসমক্ষে নিবেদন করিতেন।

স্বর্ণামাত্য।

স্বর্ণামাত্যদিগের উপর এই ভার অর্পিত হইল যে, তাহারা রাজসভায় ভোজনার্থ রাজ-নিমন্ত্রণে আগত কায়স্থদিগের ভোজনস্থলে মর্য্যাদানুসারে কায়স্থদিগের কে রাজার নিকটে কে তাহার পরে এইরূপ স্থান নির্ণয় করিয়া দিবেন। প্রথমতঃ স্বর্ণামাত্যগণ ঘটকদিগের পুস্তক দেখিয়া কায়স্থদিগের এই মর্য্যাদার ক্রম নির্ণয় করিতেন। পরে তাহারা আপনারাই ঘটকদিগের ন্যায় কায়স্থদিগের বিবাহাদি বিষয়ের এক পুস্তক রাখিতে লাগিলেন ও তাহার কার্য্য এক্ষণও প্রচলিত আছে।

নিমন্ত্রণে ভোজনের নিয়ম।

কায়স্থগণ যে রাজবাড়ীতে ভোজন করিবেন, তাহার নিমিত্ত চিলছত্তব বা চিলছত্র নামে এক বৃহৎ ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যস্থলে রাজা আসন গ্রহণ করিতেন, তন্নিকটে কুলীনগণ বসিতেন এবং তাহার পর মৌলিক, মধ্যল্য, মহাপাত্র ও অন্যান্য কায়স্থগণ ক্রমান্বয়ে চতুষ্পার্শ্বে বসিতেন; বর্ত্তমানে রাজবাড়ীর উক্ত চিলছত্র ভগ্নাবস্থায় থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সম্প্রতি সমগ্র চিলছত্রটী একটী প্রকাণ্ড বটবৃক্ষের শাখাপ্রশাখায় সমাচ্ছন্ন হইয়া অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। চন্দ্রদ্বীপ কায়স্থ সমাজে রাজার এমন প্রতিপত্তি ছিল যে, অদ্যাপি কোন কুলীন কায়স্থের বাড়ী নিমন্ত্রণ সময় রাজার জন্য একখানি আসন পৃথক্ রাখিয়া, সভার একদেশে অন্যান্য আসনে উপবেশন ক্রমতঃ ভোজন করিয়া থাকেন।

সামাজিক অপরাধীর দণ্ড।

চন্দ্রদ্বীপ কায়স্থ সমাজের কোন কায়স্থের স্বীয় পুত্র-কন্যার বিবাহ দিতে হইলে, তাহাকে বিবাহের পূর্ব্বে রাজার অনুমতি লইতে হইত এবং রাজাকে রাজমাধ্যস্থ নামে এক প্রকার সম্মানার্হ কর দিতে হইত। অদ্যাপি গ্রাম্য ভূস্বামিগণ নিম্নশ্রেণীর প্রজাগণের নিকট হইতে সাদিয়ান শুভলভ্য * আদায় করিয়া থাকেন। অনেক কবুলিয়তে উক্ত সাদিয়ান দেওয়ার কথা লিখা হয়। চন্দ্রদ্বীপ-রাজের সামাজিক বিধি কেহ লঙ্ঘন করিলে থাসথাল মামিক নিম্নশ্রেণীর শূদ্রজাতীয় এক সম্প্রদায় উক্ত অপরাধীকে ধৃত করিয়া রাজ-সমীপে হাজির করিত এবং তাহার অপরাধ নির্ণয় হইলে রাজা তাহার দণ্ড বিধান করিতেন।

পত্র লিখিবার পাঠ।

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি পত্র লিখিবার জন্য নিম্নলিখিত পাঠ ব্যবহারের আদেশ প্রদান করিতেন।

ব্রাহ্মণ—নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ।

কুলীন কায়স্থ—শ্রীঅমুক—সানুগ্রহ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে।

নিম্নশ্রেণী—রোক্কা বিশেষ।

ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ রাজাকে পত্র লিখিবার সময় আরদাস শ্রীঅমুক—নিবেদনঞ্চ বিশেষ, এই পাঠে পত্র লিখিবার নিয়ম ছিল। কায়স্থগণ রাজ-সকাশে উপস্থিত হইলে কুর্নিশ অর্থাৎ ললাটে হস্ত স্পর্শ করিয়া, রাজাকে অভিবাদন করিতেন। এই সকল রীতি অদ্যাপি প্রচলিত আছে।

* সাদিয়ান পারস্য শব্দ। ইহার বঙ্গানুবাদ বিবাহে ভূস্বামীর প্রাপ্য কর।

(১০ম রাজা) কীর্ত্তিনারায়ণ, (১১শ রাজা) বাসুদেবনারায়ণ।

বঙ্গাব্দ ১০৭৫—১০৯৫ সালের মধ্যবর্ত্তী সময়।

(পর্টুগীজ বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা)।

রাজা রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দৌহিত্র রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একজন খ্যাতনামা যোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার সময় সমর-বিভাগের বিশেষ উন্নতি হয়। রাজা কীর্ত্তানারায়ণের সময় ইউরোপ হইতে দলে দলে পর্টুগীজ, ওলন্দাজ ও দীনেমারগণ (ডেন্মার্কবাসিগণ) বঙ্গদেশে আগমন করিতে লাগিলেন এবং সুবিধা পাইলেই তাহারা নানাস্থানে অত্যাচার করিতেন। রাজা রামচন্দ্রের সময়ের পর্টুগীজ সেনাপতি জন্‌গেরী দশ সহস্রাধিক সেনা নিয়া চন্দ্রদ্বীপ-রাজসরকারে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রতি সুচতুর রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের সন্দেহ হওয়ায় জন্‌গেরীকে তিনি বরখাস্ত করেন। ইহাতে জন্‌গেরী তাঁহার সৈন্যসমূহ নিয়া ও অপর একদল সহ একত্রে চন্দ্রদ্বীপের উত্তর পূর্ব্ব সীমানায় উৎপাত-উপদ্রব আরম্ভ করিতে থাকে। তখন মহাবীর কীর্ত্তিনারায়ণ আপন সুশিক্ষিত সেনাদল সহ উক্ত পর্টুগীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। মেঘনা নদীর উপকূলে বর্ত্তমান মেহেন্দীগঞ্জ ষ্টেসনের অন্তর্গত সুলতানী, লাক্ষা, বল্লভপুরের নিকটবর্ত্তী নদীতটে ও নদী মধ্যে ক্রমাগত তিন দিবস কীর্ত্তিনারায়ণ অমিততেজে সৈন্য চালনা করেন। বীরবর রামমোহন, রামেশ্বর, মদন সিং প্রভৃতি সৈন্যগণ প্রদীপ্ত হুতাসনের ন্যায় যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিয়া শত্রুসৈন্য ভস্মীভূত করিতে-ছিলেন। রণবাদ্য ও কামানের গুড়ুম্ গুড়ুম্ শব্দে তখন মেঘনা-উপকূল

কম্পিত হইয়াছিল। ক্রমান্বয় তিন দিবস যুদ্ধের পর পর্টুগীজদিগের বহু পরিমাণে বলক্ষয় হইলে তাহারা নিরস্ত্র হইয়া, কীর্ত্তিনারায়ণের সহিত সন্ধির প্রার্থী হন এবং তাহারা চন্দ্রদ্বীপ সীমার ভিতরে আর থাকিতে পারিবেন না এবং অত্যাচার-উপদ্রব করিবেন না এইরূপ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করায়, রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ আপন সৈন্যবলসহ চন্দ্রদ্বীপে প্রত্যাগমন করেন। যেস্থানে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহাকে সংগ্রামপুর বলিত; উক্ত স্থান এক্ষণ মেঘনা নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। ঐ স্থানে বহিঃশত্রুর আক্রমণ রক্ষার্থ একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, তাহার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে।

রায়গড় দুর্গ নির্ম্মাণ।

রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ বহিঃশত্রুর আক্রমণ নিবারণ জন্য কালীজিড়া নদীর পূর্ব্বপাড়ে নলছিটী নদীর সঙ্গমস্থলে জাগুয়াগ্রামের নিকট একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত হইলেও আশ্চর্য্য কৌশলে উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল; উক্ত দুর্গের অধিকাংশই বর্ত্তমান আছে।

রায়পুর দুর্গ নির্ম্মাণ।

রাজা রামচন্দ্র কালীজিড়া নদীর পশ্চিমপাড়ে বর্ত্তমান ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড রাস্তার দক্ষিণে নলছিটী নদীর পাড়ে নিম্নে পাকা গাঁথনীর নির্ম্মিত একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন এবং রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ উহার পুনঃ সংস্কার সাধন করেন। *

---

* ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে সম্রাট সাহজাহনের পুত্র সুলতানসুজা বাঙ্গালার গবর্ণর হইয়া এদেশে আগমন করেন। তাঁহার নামানুসারে উক্ত দুর্গের নির্ম্মিত স্থানকে সুজাবাদ রাখা হয়, অদ্যাপি ঐ নাম প্রচলিত আছে। তিনি তাঁহার নাম ভবিষ্যৎ স্মরণার্থ রাখার জন্য

কোটের দোনের গড়খাই।

বরিশাল হইতে বাখরগঞ্জ যে ডিষ্ট্রিক্টবোর্ডের রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তার কাছে কোটের দোনের নিকট একটী মৃত্তিকা নির্ম্মিত গড়খাই আছে, উহাও রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের আমলের নির্ম্মিত।

ঢাকার নবাবের সহিত মিত্রতা স্থাপন।

ঢাকার নবাব কীর্ত্তিনারায়ণের বীর্য্যবত্তার কথা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে ঢাকায় আহ্বান করিয়া তৎসহ মিত্রতা স্থাপন করেন এবং আবশ্যক হইলে তাঁহার সাহায্য করিবেন, এমত অনুরোধ করেন। একদা নবাব একটী প্রসিদ্ধ যুদ্ধে কীর্ত্তিনারায়ণকে সাহায্যার্থ আহ্বান করেন। সেই যুদ্ধ অন্তে নবাব এবং কীর্ত্তিনারায়ণ এক তাম্বুর ভিতরে ছিলেন, হঠাৎ নবাবের রন্ধনাগারের গন্ধ কীর্ত্তিনারায়ণের নাসারন্ধ্রে প্রবিষ্ট হইল। তিনি নাকে রুমাল দেওয়ায় নবাব তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তৎপর নবাব বলিলেন আপনাদের শাস্ত্রে আছে, "ঘ্রাণে চার্দ্ধ ভোজনং" সুতরাং আপনার জাতি গিয়াছে। এই কথায় কীর্ত্তিনারায়ণ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং বৈমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাসুদেবনারায়ণকে মন্ত্রাভিষিক্ত

ঝালকাঠীর পূর্ব্বদিকে সুতালরীতে হিন্দু নির্ম্মিত অত্যুচ্চ দেউলের উপরে নিজ নাম অঙ্কিত করিয়া যান। উক্ত দেউলে পারস্য অক্ষরে "সাসুজা" লিখিত আছে। সুজাবাদে চন্দ্রদ্বীপ রাজার আনীত বক্সারী হিন্দুস্থানী বহুতর সৈন্য স্ত্রী-পুত্রাদি নিয়া বাস করিত। এইখানেই আসমান সিং ও রামদুর্গার লোমহর্ষণ ঘটনা হইয়া আসমান সিংহের ফাঁসী হইয়াছিল। হিন্দুস্থানী আসমান সিং ও তাঁহার স্ত্রী রামদুর্গার বিবরণ সম্বলিত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক জনৈক মুসলমান লেখক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়া এজিলার নানাস্থানে প্রচলিত আছে।

রাজা করিয়া নিজে রাজ্যের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত রহিলেন। ফলতঃ বাসুদেব-নারায়ণ নামমাত্র রাজা রহিলেন, কীর্ত্তিনারায়ণই কর্ত্তৃত্বাদি করিতেন। ইহার ঐ অবস্থার সময় রাজবাড়ীর পশ্চিমমুখী বেড়ের পশ্চিমপাড় বাদলা নামক স্থানে নিজ ব্যয়ে মুসলমানদের ভজনার্থ একটী মসজিদ ও একটী দরগাখোলা প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তিনি হিন্দু ও মুসলমানকে সমভাবে দেখিতেন। মাঠের মধ্যে উক্ত মসজিদটীর ভগ্নাবশেষ এক্ষণও বিদ্যমান আছে। বরিশাল হইতে বানরিপাড়া যাইতে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড রাস্তা হহতে উহা দেখিতে পাওয়া যায়।

চতুষ্পাঠীর সাহায্য।

রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের সময় চন্দ্রদ্বীপের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়, তিনি সংস্কৃত ভাষার উন্নতি জন্য স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠীর পণ্ডিতগণকে বিশেষ উৎসাহিত করেন। তাঁহার সময় এ জিলায় নলচিড়া, উজিরপুর, শিকারপুর, রাকুদিয়া, রহমতপুর, মানপাশা, বৈচণ্ডী, হোসেনপুর, গৈলা, ফুল্লশ্রী, তারাকুপী, খলিশাকোটা প্রভৃতি স্থানের টোলের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা নলচিড়ার চতুষ্পাঠী সর্ব্বাধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল, এজন্য নলচিড়াকে নিম্ন নবদ্বীপ বলিত। অদ্যাপি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায়কালীন নলচিড়াবাসী পণ্ডিতগণকে অগ্রে বিদায় প্রদত্ত হইয়া থাকে।

রাজা কীর্ত্তিনারায়ণ সম্বন্ধে প্রাচীন কায়স্থকারিকা গ্রন্থকার কি লিখিয়াছেন দেখুন—

"কীর্ত্তিনারায়ণো বীরো মহামানি তদগ্রজঃ।
জয়দেব পুরো সোঽপি নৌযুদ্ধে সুপ্রসিদ্ধকঃ॥

মেঘনাদোপকূলে স ফেরঙ্গ সৈন্যকৈঃ সহ।
অদ্ভুতং সমরং কৃত্বা তীরাৎ সর্ব্বান্ তাড়য়ৎ॥
জাহাঙ্গীর পুরাধীশো নবাব যবনস্ততঃ।
স্থাপয়ামাস মিত্রত্বং সার্দ্ধ তেন প্রযত্নতঃ॥"

দ্বাদশ নৃপতি প্রতাপনারায়ণ।

রাজা বাসুদেবনারায়ণের কোন সন্তানাদি ছিল না। রাজা কীর্ত্তি-নারায়ণ ও বাসুদেবনারায়ণের লোকান্তরে বাসুদেবনারায়ণের পুত্র প্রতাপ-নারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রতাপনারায়ণের এক পুত্র ও এক কন্যা হয়, পুত্রের নাম প্রেমনারায়ণ এবং কন্যার নাম বিমলা-সুন্দরী। প্রতাপনারায়ণ রায়ের জীবিতাবস্থাতেই রাজকুমার প্রেমনারায়ণের মৃত্যু হয়। রাজকুমারী বিমলার সহিত ঢাকা জিলার অন্তর্গত উলাইল গ্রাম নিবাসী গৌরীচরণ মিত্র মজুমদারের বিবাহ হইয়াছিল। প্রেমনারায়ণের মৃত্যু সময় রাজা প্রতাপনারায়ণের দুটী দৌহিত্র বর্ত্তমান ছিল। উহার জ্যেষ্ঠটীর নাম উদয়নারায়ণ এবং কনিষ্ঠের নাম রাজনারায়ণ। প্রেমনারায়ণের মৃত্যু হইতেই চন্দ্রদ্বীপে বসুবংশের রাজত্ব শেষ হয়। রাজা প্রতাপনারায়ণ যাহাতে তাঁহার দৌহিত্রগণ রাজত্ব পাইতে পারেন, তজ্জন্য তাঁহার বিশ্বস্ত দেওয়ান রহমতপুর নিবাসী রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে দিল্লীতে সনন্দ আনিতে প্রেরণ করেন। উক্ত দেওয়ানবংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই পুস্তিকার বিবিধ বিবরণে লিখিত হইল।

শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি।

রাজা প্রতাপনারায়ণের সময় মাধবপাশার ও উজিরপুরের তন্তুবায়গণ অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র নির্ম্মাণ করিত এবং উহা ঢাকার মস্‌লিনের সমকক্ষতা লাভ করিয়াছিল। অদ্যাপি পূজার বাজারে এই তন্তুবায়কুল বিস্তর সূক্ষ্ম বস্ত্র ও মশারীর ছিট, সর্ব্বসুন্দর প্রভৃতি নানাপ্রকার রঙ্গীন্ কাপড় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত করে। বরিশালবাসীর দুর্ভাগ্য, নচেৎ ইহারা এক্ষণও উৎসাহ পাইলে পূর্ব্ববৎ সূক্ষ্ম শিল্প প্রদর্শন করিতে পারে। রাজা বাসুদেবনারায়ণ, প্রতাপনারায়ণের সময় এবং ইঁহাদের পরবর্ত্তী রাজা উদয়নারায়ণের সময় ইহাদের প্রস্তুতি কাপড়, ছিট প্রভৃতি বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে রপ্তানী হইত; সুতরাং তৎকালীন ইহাদের প্রত্যেকের গৃহ ধন-ধান্যে পরিপূরিত ছিল।

ত্রয়োদশ নৃপতি রাজা উদয়নারায়ণ।

(বঙ্গাব্দ ১১৩০—১১৭৫ সাল।)

রাজা প্রতাপনারায়ণ জীবিত থাকিতেই তৎপুত্র প্রেমনারায়ণ পরলোক গমন করায়, কন্যা বিমলার পুত্রদ্বয় উদয়নারায়ণ ও রাজনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। উক্ত উভয় ভ্রাতা মধ্যে জ্যেষ্ঠ উদয়নারায়ণ অভিষিক্ত হইয়া রাজাসন গ্রহণ করেন। কনিষ্ঠ রাজনারায়ণ রাজমাতা নাম্নী একখানি বৃহৎ তালুকের স্বত্ব নিয়া মাধবপাশার উত্তরাংশে প্রতাপপুর নামক গ্রামে বসতি স্থান নির্দ্দেশ করতঃ তথায় বাস করিতে থাকেন। উক্ত রাজনারায়ণের বংশধরগণকে লোকে অদ্যাপি রাজা বলিয়া থাকে। রাজা উদয়নারায়ণ ও রাজা রাজনারায়ণের আদিপুরুষ কান্যকুব্জাগত কালিদাস হইতে সপ্তদশপুরুষ। নিম্নে তাহার একটী বংশপত্রিকা দেওয়া গেল;—

(১) কালিদাস মিত্র। (২) গোট মিত্র। (৩) বাহন মিত্র। (৪) গৌরী মিত্র। (৫) পাই মিত্র। (৬) সুলোচন মিত্র। (৭) ত্রৈলোক্য মিত্র। (৮) সুপ্রসাদ মিত্র। (৯) ভাস্কর মিত্র। (১০) থাক মিত্র। (১১) বিদ্যাধর মিত্র। (১২) শিবানন্দ মিত্র। (১১) সানন্দ মিত্র, ইহার অন্য নাম শ্রীরাম খাঁ। (১৪) বলরাম মিত্র। (১৫) হরিনারায়ণ মিত্র। (১৬) গৌরীচরণ মিত্র ইঁহার দুই পুত্র—(১৭) উদয়নারায়ণ ও রাজনারায়ণ।

রাজা উদয়নারায়ণ চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য ভিন্ন ঢাকা জিলার অন্তর্গত পরগণে সুলতান প্রতাপ, ইসপসাহি, নরুল্লাপুর ও অন্যান্য পরগণার জমিদার ছিলেন সুলতানপ্রতাপ পরগণার জমিদারী ১২৪৮ সাল পর্য্যন্ত উদয়নারায়ণের বংশধরদের ছিল, তৎপর উহা বাকী রাজস্বে নীলাম হইয়া যায়। রাজা উদয়নারায়ণের জন্মভূমি উলাইল গ্রাম, ঢাকা জিলার বংশনদীর তটে অবস্থিত ছিল। বহুকাল অতীত হইল উক্ত উলাইল গ্রাম বংশ ও সাভারের নিকটস্থ নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে এবং রাজার জ্ঞাতিগণ বর্ত্তমানে ঢাকা জিলার অন্তর্গত তেতুলাঝোরা, দৌলতপুর, জালালদী গ্রামে বাস করিতেছেন।

রাজা উদয়নারায়ণ রাজত্ব লাভ করিবার পর ঢাকার নবাব তাঁহার শ্যালক থাদি মজুমদারদ্বারা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করেন; ইহাতে রাজা উদয়নারায়ণ খিদ্যমান হইয়া, নবাব সমীপে গমন করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নবাবের বিচিত্র মতি, তিনি বলিলেন "তুমি যদি এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রকে শীকার করিয়া অক্ষত শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পার, তাহাহইলে বুঝিব তুমি রাজ্য লাভের উপযুক্ত ব্যক্তি। ইহা শুনিয়া উদয়নারায়ণ নবাব ও অপর বহুজন সমক্ষে সদ্য ধৃত এক প্রকাণ্ড ব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধে করেন এবং ব্যাঘ্রকে নিহত করিয়া অক্ষত শরীরে আসিয়া নবাবের নিকট পুরস্কার

প্রার্থনা করিলেন। নবাব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজ্যভার গ্রহণের অনুমতি দিলেন।

রাজা উদয়নারায়ণ অত্যন্ত দানশীল নরপতি ছিলেন। চন্দ্রদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণজাতির মধ্যে প্রায় প্রত্যেক গ্রামে ব্রাহ্মণমাত্রেই তাঁহার প্রদত্ত ব্রহ্মত্র ভূমি আবহমানকাল ভোগ করিয়া আসিতেছেন। তিনি চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ কালীন এবং প্রায় প্রত্যেক পুণ্যাহ তিথিতেই ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিতেন। চন্দ্রদ্বীপের সমগ্র রাজন্যবর্গ মধ্যে কেহই দানশীলতায় রাজা উদয়নারায়ণের সমকক্ষ নহেন; তিনি দেব-দ্বিজে অসাধারণ ভক্তিপরায়ণ ছিলেন।

পাঁচখানি সনন্দের বিবরণ।

রাজা আদিশূরকর্ত্তৃক ৯৯৯ শকাব্দে * বঙ্গদেশে আনীত পঞ্চ ব্রাহ্মণ মধ্যে ছান্দর ঋষির আটপুত্র মধ্যে ধীর পূতিতুণ্ডের ধারায় একাদশপুরুষে গোবর্দ্ধনাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। এই গোবর্দ্ধনাচার্য্য মহারাজা লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রদাতা গুরু ও পঞ্চরত্নের (পশুপতি, ধোয়ী, শরণ, গোবর্দ্ধন ও জয়দেব) একরত্ন ছিলেন। ১৪১৬ শকাব্দে এ জিলার ফুল্লশ্রী নিবাসী প্রাচীন কবি ৺ বিজয় গুপ্ত পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। ঐ সময় ফুল্লশ্রী মানসীর ৺ মনসা-দেবীর প্রত্যক্ষের কথা বঙ্গদেশের বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তখন পণ্ডিত গোবর্দ্ধনাচার্য্যের অধস্তন প্রপৌত্র চক্রপাণি পূতিতুণ্ড তাঁহার আটপুত্র মধ্যে ব্যাস, পুণ্ডরীকাক্ষ, ভূধর এই তিন পুত্র সহ ফুল্লশ্রীতে মনসার পূজা দিতে আসেন। তৎকালীন এতদ্দেশের নদীসমূহ ক্রমে চড়া পড়িয়া মনুষ্যের

---

* শ্রীমদাদিশূরো নব নবত্যধিক নবশতি শতাব্দে পঞ্চ ব্রাহ্মণানয়ামাস।

ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতম্।

আবাসভূমি হইয়াছিল। তাহাতে তিনি মনসাদেবীর প্রতি ভক্তিপ্রবণ হইয়া তাঁহার তিনটী পুত্রকে এ দেশে রাখিয়া যান। তন্মধ্যে পুণ্ডরীকাক্ষ ও ভূধরের সন্ততিগণ এ জিলার শোলক, বামরাইল প্রভৃতি গ্রামে এবং ব্যাস পূততুণ্ড সন্ততিপরম্পরা রাকুদিয়া গ্রামে বাস করিতে থাকেন। উক্ত ব্যাসের অধস্তন একাদশপুরুষে তিতুরাম নামান্তর রামরাম পূততুণ্ড আপন পরিবারস্থ লোকের সহিত কলহ করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন উদ্দেশ্যে পরিবারস্থ লোকদিগকে না বলিয়া নিশীথে গৃহত্যাগ করেন এবং হোসেনপুর আসিয়া সূর্য্যদেব চক্রবর্ত্তীর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সূর্য্যদেব চক্রবর্ত্তী কৌশলে তাহার পরিচয়াদি গ্রহণ করিয়া, রাকুদিয়া সংবাদ দেন এবং তাহার পিতা মহাদেব পূততুণ্ড তাহাকে আনয়ন জন্য হোসেনপুরে আগমন করেন; কিন্তু রামরাম কিছুতেই রাকুদিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না। অবশেষে উক্ত সূর্য্যদেব চক্রবর্ত্তীর একমাত্র দুহিতার পাণিগ্রহণ করিয়া তিনি হোসেনপুরে বসতি করিতে থাকেন। বঙ্গাব্দ ১১৪৮ সনে তিনি রাকুদিয়া হইতে হোসেনপুর আগমন করেন। রামরাম পূততুণ্ড জ্যোতিষ শাস্ত্রে অগাধ পণ্ডিত ছিলেন, ইহার অন্য নাম ছিল তিতুরাম পূততুণ্ড, কিন্তু তিনি রামরাম নামেই সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন; তিনি শ্বশুরের উপদেশানুসারে মধ্যে মধ্যে চন্দ্রদ্বীপ-রাজ উদয়-নারায়ণ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। রাজা তাঁহাকে ভাল জ্যোতির্ব্বিদ জানিয়া স্বসম্মানে গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে কিছু ভূমি দান করিতে অভি-প্রায় জ্ঞাপন করেন, রামরাম পূততুণ্ড সহসা দান গ্রহণে অনিচ্ছুক ছিলেন; পরে ১১৫৪ সালের ১২ই বৈশাখ তারিখে রামরামের শ্বশুর সূর্য্যদেব চক্রবর্ত্তী রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার প্রথম সনন্দ গ্রহণ করেন। তৎকালে রাজদরবার হইতে সনন্দখানি সূর্য্যদেব চক্রবর্ত্তী উপস্থিত গ্রহণকারী বিধায়

তাঁহার নামে লিখিয়া দেওয়া হয় এবং রামরাম পূততুণ্ডের নাম সেরেস্তার কাগজে ব্রহ্মত্রদার বলিয়া লিখিয়া রাখা হয়। ইহার পরে রামরাম পূততুণ্ড রাজা উদয়নারায়ণের কোন ভবিষ্যৎ ঘটনা প্রকাশ করিলে রাজা অচিরাৎ তাহার প্রত্যক্ষতা উপলব্ধি করিয়া, রামরামকে ক্রমিক আরও চারিখানি সনন্দ প্রদান করেন। উহার একখানি ১১৬৬ সনের ২৭শে পৌষ এবং ১১৬৭ সনের ১৭ই পৌষ আপন পুত্র প্রাণকৃষ্ণ পূততুণ্ড নামে, আর একখানি ঐ সনের ২রা মাঘ নিজ নামে এবং অপর একখানি ১১৭১ সনের ২রা জ্যৈষ্ঠ রামরামের দ্বিতীয় পুত্র সূর্য্যনারায়ণ নামে সনন্দ প্রাপ্ত হন। রামরামের গণনার দ্বারা রাজা যতবার প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করিয়াছিলেন, ততবারই তাঁহাকে ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। নিম্নে উহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল।

	সনন্দ গ্রহিতার নাম	সনদের তারিখ	যে গ্রামে সম্পত্তি	বর্ত্তমান থানা।
(১)	সূর্য্যদেব চক্রবর্ত্তী	১১৫৪ সাল ১২ই বৈশাখ	চড়াদী	বাখরগঞ্জ
(২)	রামরাম পূততুণ্ড	১১৬৬ সাল ২৭শে পৌষ	কৌথালী আদমপুর	বাউফল
(৩)	প্রাণকৃষ্ণ পূততুণ্ড	১১৬৭ সাল ১৭ই পৌষ	কল্যাণদরকাঠী	ঝালকাঠী
(৪)	রামরাম পূততুণ্ড	১১৬৭ সাল ২রা মাঘ	রামচন্দ্রপুর	ঐ
(৫)	সূর্য্যনারায়ণ পূততুণ্ড	১১৭১ সাল ২রা জ্যৈষ্ঠ	শিবশনকাঠী	ঐ

একখানি সনন্দের

নমুনা।

শ্রীশ্রী…(অস্পষ্ট)
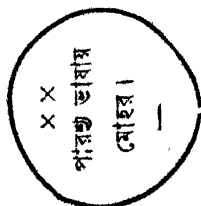
ইয়াদিকীর্দ্দ শরণ মঙ্গলালয় মহামহিম শ্রীযুক্ত রাজোদয়নারায়ণ মহাশয়াণাং শ্রীসূর্য্যদেব চক্রবর্ত্তী সুচরিতেষু নমস্কারা কার্য্যঞ্চাগে পরগণে (অস্পষ্ট) গয়রহ সরকারে বাক্‌লায় শ্রীরাজোদয়নারায়ণ রায়ের ধর্ম্মে চরাজদী জোয়ারে সোয়াকাণি জমি তোমারে ব্রহ্মত্র দিল। জমি আমল করিয়া দপ্তরে আপন নাম ব্রহ্মোত্তর লিখাইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে রহ। ইতি ১১৫৪ সাল তেরিখ ১২…খ

মোকাম শ্রীনগর হুকুম হুজুর।

চন্দ্রদ্বীপ রাজার দত্ত উপরোক্ত সনন্দগুলি উত্তরকালে ঢাকার কালেক্‌টরীতে রেজিষ্টরী করিতে এবং চিঠা দাখিল করিতে হইয়াছিল। ১২০৭ সনে ঐ চিঠা দাখিল করা হয়।

চিঠার উপর অংশ।

শ্রী…অস্পষ্ট।

নং ৫২

দফাওয়ারী লাখেরাজ বকয়েদ তফরিক থানা মিলানী…

(অস্পষ্ট) আদালত ফৌজদারী জিলে ঢাকা জালালপুর।

পর্টুগীজ জাতির অবস্থিতি।

রাজা উদয়নারায়ণ রায়ের সময়ে তাঁহারই নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার অধীনস্থ সৈন্যগণ মধ্যে অধিকাংশ লোক বর্ত্তমান সাহেবগঞ্জের নিকটবর্ত্তী শিবপুরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া তথায় একটী ভজনালয় (গির্জ্জা) প্রতিষ্ঠিত করে। রাজার অনুগ্রহে ইহাদের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল ছিল। শিবপুরের ভজনালয় কালক্রমে গোয়া বান্দল প্রভৃতি স্থান হইতে অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ পাদ্রী আসিয়া উহার তত্ত্বাবধান করায়, উক্ত গ্রামের নাম পরিশেষে পাদ্রী শিবপুর হইয়াছে; অদ্যাপি ঐ নামই বর্ত্তমান আছে। এখানে একটী পোষ্টাফিস ও একটী মাইনর স্কুল আছে। পূর্ব্বাপেক্ষা এ জাতীয় লোকের অবস্থা এক্ষণ খারাপ হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার অধিবাসিগণ মধ্যে পূর্ব্বকালে ডোমিঙ্গ ডিছেলবা প্রসিদ্ধ ধনী ছিলেন। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, উক্ত ডিছেলবা সাহেবের বাড়ী ধামাদ্বারা টাকা মাপ করা হইত। রামচন্দ্রপুর নিবাসী গুহ পরিবারের পূর্ব্বপুরুষ জনৈক গুহ উক্ত ডিছেলবা সাহেবের প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন। উক্ত ডোমিঙ্গ ডিছেলবা সাহেবই শিবপুর ষ্টেট স্থাপয়িতা। বর্ত্তমানে ইহার বংশধরগণ ফিরিঙ্গী নামে অভিহিত; ইহারা বাঙ্গালীর ন্যায় ধুতি চাদর পরিধান করে এবং অধিকাংশই বঙ্গভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। পুরাকালীয় পর্টুগীজ ফিরিঙ্গী সাহেবদের কারবার স্থান ছিল বলিয়াই, বাখরগঞ্জ থানার পূর্ব্বাংশ স্থান সাহেবগঞ্জ নামে অভিহিত হইয়াছে।

তালুক সৃজন।

রাজা উদয়নারায়ণের সময় চন্দ্রদ্বীপ জমিদারীর অধীন তালুক সৃষ্টি হইতে আরম্ভ হয়। রাজা তাঁহার ভ্রাতা রাজনারায়ণ রায় নিমিত্ত "রাজমাতা" নাম্নী এক তালুক সৃষ্টি করিয়া দেন। ইহা ব্যতীত মহল হিস্তাজাত ও মহল উজুহাত এই নামে দুইটী পৃথক্ সম্পত্তি সৃজন করিয়া ইহাও ভ্রাতা রাজ-নারায়ণকে অর্পণ করেন; এই তিনটী একত্র করিলে উহাও এক বৃহৎ জমিদারী সদৃশ ছিল। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী, রামবল্লভ চক্রবর্ত্তী, রূপনারায়ণ চক্রবর্ত্তী, রাজারাম সেন, কৃষ্ণরাম সেন, রাধাকান্ত সেন, কাশীনাথ বসু, কৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতি নামে বহুতর তালুক সৃষ্টি হইয়া জমিদারীর আয় অধিক পরিমাণে কমিয়া যায়। এ জিলায় যত তালুকদার আছেন, সকলের মূলেই চন্দ্রদ্বীপের রাজার সম্পত্তি।

প্যাদা, পাইক নামে তালুক সৃজন।

বর্ত্তমানে মাহাম্মদ হায়াত, নরুল্লা খয়রুল্লা, সোনা উল্লা ক্রোশ মাহাম্মদ প্রভৃতি তালুকগুলি প্যাদা, মৃধা ও পাইক প্রভৃতির নামে সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহার কোন কোন তালুকের আয় বার্ষিক পাঁচ সহস্রের উপরে হইবে। লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় উক্ত তালুকগুলির তৎকালীন দখিলকারগণ গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া নিয়াছেন এবং এ জিলার বহু ভদ্র পরিবার উক্ত তালুকগুলির আয়দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছেন।

জিম্মা তালুক সৃজন।

রাজার রাজসরকারী খাজানা আদায়ের জন্য মফস্বল যে সকল তহশীলদার ছিল, তাহাদের অধিকাংশ কর্ম্মচারী রাজবাড়ী নামমাত্র কর

লিখাইয়া এক একটী মহল জিম্বা নিত। প্রকৃত প্রস্তাবে উক্ত মহলের প্রজাগণ হইতে যে কিছু রাজস্ব আদায় উসুল হইত, তাহা আদায়কারী গোমস্তাগণ নিজ প্রয়োজনে ব্যয় করিতেন এবং রাজাকে নামমাত্র কর দিয়াই নিষ্কৃতি পাইতেন। এইরূপ জিম্বা তালুকের নাম যথা—মাহাম্মদ আজিম, সোনারাম সেন, রামবল্লভ, রত্নেশ্বর দাস প্রভৃতি জিম্বা তালুকগুলি কালক্রমে চন্দ্রদ্বীপ পরগণার তৌজী বন্দোবস্তের পরে নানা তৌজীর অধীন হইয়া রহিয়াছে।

উক্তরূপ তালুক ও জিম্বা তালুকদ্বারা চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের কি পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। বোধহয় উক্ত তালুক ও জিম্বা তালুক-গুলি যদি শেষকালেও রাজা তাঁহার নিজ আয়ত্তাধীন রাখিতেন, তবে বর্ত্তমানে তাঁহাদের বংশধরগণ পর-মুখাপেক্ষী হইতেন না।

নথুল্লবাদ ৶ কালী স্থাপন।

বর্ত্তমানে বরিশাল হইতে মাধবপাশা যাইতে যে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড রাস্তা আছে, উহার দুই মাইলের নিকট একটী পাকা ইটের পোল আছে। ঐ স্থানকে নথুল্লাবাদ বলে। ঐ স্থানে বর্ত্তমানে যে খালের উপর পোল আছে, রাজা উদয়নারায়ণের সময় উহা একটী ছোট নদী ছিল। ঐ স্থানে একখানি হাট ছিল, তথায় সপ্তাহে দুইদিন হাট বসিত। প্রাচীন দলীলাদিতে উক্ত স্থানের সীমানায় নদীর উল্লেখ দেখিকে পাওয়া যায়। রাজা উদয়নারায়ণের সময় নদীর পাড়ে রাজার এক কাছারী বাড়ী ছিল এবং তৎকালীন নথুল্লাবাদ অত্যন্ত সমুন্নত স্থান ছিল; নিকটবর্ত্তী অনেক প্রজার বিচারাদি নথুল্লাবাদ কাছারীতে সম্পন্ন হইত।

রাজা উদয়নারায়ণ রায় এই কাছারী বাড়ীতে ধুমধামের সহিত ৺ কালমূর্ত্তি স্থাপন করেন এবং বার্ষিক তিন শত টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি প্রদান করিয়াছিলেন। ১২৬৪ সালে ঢাকা—ঢাকেশ্বরী কালীবাড়ীর সন্ন্যাসী স্বর্গীয় কালীচরণ গিরি গোস্বামীর সহিত কাশীপুরের এক শূদ্র পরিবারের দেওয়ানী মোকদ্দমা হইয়াছিল। উক্ত মোকদ্দমায় হাইকোর্ট পর্য্যন্ত আপীল হয়, কিন্তু সন্ন্যাসীর ভাগ্য কিছুতেই প্রসন্ন হয় নাই। উক্ত শূদ্র পরিবারই উহার সেবাইত বলিয়া হাইকোর্ট নির্ণয় করিয়া দিয়াছিলেন।

কাশীপুরে মহামায়া বিগ্রহ স্থাপন।

কাশীপুরে কাঠগড় পল্লীতে যে স্থানে সিপাহীদের গড় ছিল। তথায় রাজা উদয়নারায়ণের সময় একটী পুষ্করিণী খননকালে মহামায়া নাম্নী বিগ্রহের :একখানি প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া যায়। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, রাজা উদয়নারায়ণ ৺ মহামায়া কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন এবং স্বয়ং সপরিষদ কাঠগড় পল্লীতে আসিয়া উক্ত মূর্ত্তি মাধবপাশা নেওয়ার জন্য ইচ্ছা করেন, কিন্তু দ্বিতীয়বার স্বপ্নাদেশ হইল যে, উক্ত মূর্ত্তিকে ঐ স্থানেই স্থাপন করিতে হইবে। তদনুসারে রাজা যথাশাস্ত্রমতে ঐ মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া যান। উক্ত মহামায়া দেবীর পূজা অর্চ্চনার জন্য তিনি বার্ষিক ৩০০ শত টাকা আয়ের সম্পত্তি প্রদান করেন। কাঠগড় অধিবাসী মাঙ্গু তেওয়ারী নামিক জনৈক হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ উহার সেবাইত নিযুক্ত হন। উক্ত তেওয়ারীর লোকান্তরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী আদরমণি দেবী রামানন্দ ব্রহ্মচারী নামক জনৈক সংসার-বিমুখ ব্যক্তির প্রতি ৺মহামায়ার অর্চ্চনার ভার অর্পণ করেন। উক্ত ব্রহ্মচারী ও আদরমণি দেব্যার উইল অনুসারে কাশীপুর—চহুতপুর পল্লীস্থ পীতাম্বর

মুখোপাধ্যায় নামিক জনৈক ব্রাহ্মণ এবং কানু সিংহ নামিক জনৈক ব্যক্তি সেবাইত নিযুক্ত হন। বর্ত্তমানে কানু সিংহের অংশ রামচন্দ্রপুরের গুহ পরিবারস্থ বাবু কালীপ্রসন্ন গুহ চৌধুরী খরিদ করিয়া মহামায়ার পূজা অর্চ্চনার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রতি বৎসর মাঘী সপ্তমীর দিন এইখানে মেলা হয় এবং ঐ দিন নানা স্থান হইতে বহু লোক তথায় আগমন করিয়া থাকে।

শঙ্কর চক্রবর্ত্তী।

রাজা উদয়নারায়ণের সময় মাধবপাশা রাজধানীতে শঙ্কর চক্রবর্ত্তী নামে একজন ব্রাহ্মণ ভাণ্ডার-রক্ষকের পদে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালীন এই পদকে "ভারার কাইত" বলা হইত। একদা উক্ত শঙ্কর চক্রবর্ত্তী সস্ত্রীক গঙ্গা-সাগর তীর্থে গিয়া সমুদ্রগর্ভে বিরূপাক্ষ নামে এক পাষাণময় শিবমূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। শঙ্কর অত্যন্ত নীরিহ নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলেন। কাশীপুর—চন্দ্রতপুর পল্লীতে তাঁহার বাসস্থান ছিল। তিনি দেশে আসিয়া নিজ বাড়ীতেই বিরূপাক্ষ দেবকে স্থাপন করেন। রাজা উদয়নারায়ণ এই বিগ্রহের সেবার জন্য বিস্তর ভূমি দান করিয়াছিলেন। কালক্রমে শঙ্কর চক্রবর্ত্তীর বংশে ভোলানাথ ব্রহ্মচারী জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আজীবন কৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া, বিরূপাক্ষ দেবের সেবা করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি কাশীপুর নিবাসী ডাক্তার আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ও চেষ্টায় এই বিগ্রহের জন্য একটী ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। মন্দির নির্ম্মাণের ব্যয় ময়মনসিংহ জিলার আঠারবাড়ীয়ার জমিদার শ্রীযুক্তা জ্ঞানদাসুন্দরী চৌধুরাণী দিয়াছেন।

রাজকর্ম্মচারী সীতারাম বসু।

রাজা উদয়নারায়ণের সময় ১১৬০ সনে নলচিটী থৈসনাধীন ফুলহরি গ্রামের শ্রীবল্লভ বসুর বংশধর রঘুরাম বসু কাশীপুরে আগমন করেন। তাঁহার চারি পুত্র; সীতারাম, কাশীনাথ, নন্দকিশোর ও দেবীপ্রসাদ। উক্ত চারিপুত্রের মধ্যে সীতারাম বসু তৎকালে বিদ্যাবুদ্ধিতে বিশেষ প্রখ্যাত ছিলেন; তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। তিনি বাঙ্গলা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। রাজা উদয়নারায়ণ তাঁহাকে বিচক্ষণ ব্যক্তি জানিয়া রাজসরকারে প্রধান কার্য্যকারকের পদে নিযুক্ত করেন। কালক্রমে রাজার অনুগ্রহে উক্ত সীতারাম বসু নিজ আবাসভবন কাশীপুরে প্রকাণ্ড দীঘি খনন ও ইষ্টকালয় নির্ম্মাণ করিয়া বাড়ীর সৌষ্ঠব সম্পন্ন করেন; ইঁহা-দের বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়। কাশীপুরে সীতারাম বসুর দীঘির ন্যায় এত বড় প্রশস্ত জলাশয় আর নাই। চন্দ্রদ্বীপরাজের অনুগ্রহে ইঁহারা যে ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ত্তমানে দুইটী প্রকাণ্ড খারিজা তালুক। বাখরগঞ্জ কালেক্টরীতে উহার তৌজী নং ১৭৩৫ ও ১৭৫০ বটে।

চতুর্দ্দশ নৃপতি রাজা শিবনারায়ণ রায়।

(বঙ্গাব্দ ১১৭৬—১১৮৪ সাল।)

রাজা উদয়নারায়ণের লোকান্তরে তৎপুত্র রাজা শিবনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইঁহার সময় চন্দ্রদ্বীপের বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। এই রাজা পৈতৃক উত্তরাধিকারীসূত্রে ঢাকা জিলায় সুলতান প্রতাপ পরগণার এক বষ্ঠাংশের অধিপতি ছিলেন। তিনি রামগোপাল

দালাল নামক এক ব্যক্তিকে ঐ পরগণার সমুদয় অংশ আপনার বলিয়া ইজারা স্বত্ব লিখিয়া দেন।

উলাইল নিবাসী দেবীপ্রসাদ মিত্র মজুমদার এই রাজার বিরুদ্ধে জাহাঙ্গীর নগরে (বর্ত্তমান ঢাকার) দেওয়ানী আদালতে এক নালিশ উত্থাপন করেন। তাহাতে উক্ত ইজারাদার ও দেবীপ্রসাদ মিত্র মজুমদার প্রভৃতি রাজা রাজবল্লভের পুত্র রাজা গঙ্গাপ্রসাদকে সালিস মান্য করেন। পরে সালিসের সাক্ষাতে ইজারাদার রামগোপাল দালাল ইজারা ইস্তফা করিয়া দিলে উক্ত জমিদারী ছয় অংশীদারের হস্তে পূর্ব্ববৎ প্রত্যাগত হয়। সেই মোকদ্দমার বিচারের রায় পার্শি ও বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। উক্ত রায়ের তারিখ ২১শে অগ্রহায়ণ, ১১৭৯ সাল; ইংরেজী ২রা ডিসেম্বর, ১৭৭২। জজদিগের নাম মি এন্, গ্রোভার ও রায় হরিরাম মল্লিক, মোহর শাহ আলম বাদসাহের এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর; এই সময় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাহ আলম বাদসাহের নিকট হইতে বঙ্গদেশের দেওয়ানী প্রাপ্ত হইয়া তাহার কার্য্যারম্ভ করিয়াছিলেন।

রাজা শিবনারায়ণ সোজা প্রকৃতির লোক ছিলেন, এজন্য লোকে তাঁহাকে পাগলা রাজা বলিত। তিনি এই জিলার নথুল্লাবাদ গ্রামের প্রসিদ্ধ বসুবংশসম্ভূত রাজবল্লভ রায়ের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই রাণী লোকের নিকট "কালারাণী" বলিয়া পরিচিতা ছিলেন।

পঞ্চদশ নৃপতি রাজা জয়নারায়ণ রায়।

(বঙ্গাব্দ ১১৮৫—১২২০ সাল)।

রাজা জয়নারায়ণ যখন মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখন রাজা শিবনারায়ণের মৃত্যু হয়। এজন্য জয়নারায়ণকে দুর্গাক্রোড়নারায়ণও বলা হইত। বর্ত্তমান রহমতপুর নিবাসী ৺ রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তীর বংশধর রামজীবন চক্রবর্ত্তী রাজা শিবনাবায়ণের দেওয়ান ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পর তিনি সনন্দ আনিতে যথাক্রমে দীল্লি ও ঢাকা গমন করেন। তৎকালীন বাঙ্গালার সুবাদার, রামজীবন চক্রবর্ত্তীর প্রতিভা দৃষ্টে প্রীত হইয়া, তাঁহার নিজ নামে সনন্দ আনিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু তদ্রূপ নিজ নামে আনিলে সমাজে তিনি নিন্দনীয় হইবেন, এই ভয়ে ধর্ম্ম-ভীরু রামজীবন নিজ নামে সনন্দ আনিতে অস্বীকার করেন। তিনি সুবাদারকে জানাইলেন যে, রাণী দুর্গাবতী অন্তসত্ত্বা আছেন, ভগবৎ কৃপায় তিনি অচিরাৎ পুত্ররত্ন লাভ করিতে পারেন; সুতরাং উক্ত সনন্দখানি "দুর্গাক্রোড়নারায়ণ রায়" নামে লিখিয়া দেওয়া হউক, সুবাদার বিশ্বস্ত দেওয়ান রামজীবনের উপদেশ মতে ঐরূপ নাম লিখিয়া চন্দ্রদ্বীপ জমিদারীর সনন্দ প্রদান করিলেন। রামজীবন সনন্দ সহ মাধবপাশায় প্রত্যাবর্ত্তন করার কিছুদিন পরে রাজকুমার জয়নারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন; কিন্তু রাজকুমারের ভাগ্যে এ হেন দেওয়ানের কার্য্য দেখা হইল না। যেহেতু অল্পদিন পরেই রামজীবন চক্রবর্ত্তী ক্ষয়কাশ-রোগে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। রামজীবনের পুত্র চন্দ্রশেখর, ইঁহারা রাজসরকার হইতে যে ভূসম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা উত্তরকালে ১৭২৯নং খারিজা তালুক চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামে অদ্যাপি বিখ্যাত আছে। উহার বিস্তৃত বিবরণ "বিবিধ বিবরণ" অধ্যায়ে লিখিত হইব।

শঙ্কর বক্সী।

রাজা শিবনারায়ণের বিশ্বস্ত দেওয়ান রামজীবন চক্রবর্ত্তীর মৃত্যুর পর নাবালক জয়নারায়ণের শৈশবাবস্থায় বর্ত্তমান গৌরনদী ষ্টেসনাধীন নলচিড়া নিবাসী বৈদ্যবংশসম্ভূত শিবশঙ্কর দাস বক্সী প্রধান বক্সীর পদ হইতে দেওয়ানের পদে উন্নীত হন। সাত বৎসরকাল তিনি উক্ত দেওয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি নাবালক রাজা ও রাণী দুর্গাবতীর অজ্ঞাতসারে বহুতর ভূসম্পত্তি কৌশলে হস্তগত করেন। রাণী দুর্গাবতী ইহা জানিতে পারিয়া, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের সাহায্যে উহার অধিকাংশ উদ্ধার করেন। অবশিষ্ট যাহা ছিল, তাহাও শিবশঙ্করের আত্মীয় শিবচন্দ্র দাসগুপ্ত নামে বিনামী করিয়া রাখিয়াছিলেন। বর্ত্তমান বরিশাল কালেক্টরীর তৌজী ১৭৬২নং তালুক শিবচন্দ্র দাসই শিবশঙ্কর বক্সীর সেই সম্পত্তি, এই তালুকের বার্ষিক স্থিত অন্যূন ৬০০০০ হাজার টাকা। কালক্রমে শিবশঙ্করের সেই পাপার্জ্জিত সম্পত্তি তাঁহার বংশধরের ভোগে লাগিল না; উহা বাকী রাজস্ব-দায় নীলাম হইলে লাখুটীয়ার স্বনামখ্যাত জমিদার স্বর্গীয় রাজচন্দ্র রায় চৌধুরী নীলাম খরিদ করেন। পরে তিনি ইহার অর্দ্ধাংশ জিলা ফরিদপুর নিবাসী সাহা জাতীয় গঙ্গানারায়ণ চৌধুরীকে দিয়া উহার সরিক করেন। অদ্যাপি অর্দ্ধাংশ হিসাবে উক্ত সম্পত্তি উভয় ষ্টেটের মালিকগণ ভোগ করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমানে নলচিড়া গ্রামে শঙ্কর বক্সীর বাড়ীখানি জঙ্গলাবৃত থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

দুর্গাসাগর খনন।

রাণী দুর্গাবতী কতিপয় রাজকর্ম্মচারীর মন্ত্রণায় রাজবাড়ীর পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে একটী প্রকাণ্ড দীঘি খনন করেন। ইহা এত প্রকাণ্ড যে, তিন

দ্রোণ তের কাণি অর্থাৎ পাকা ৬১ কাণি জমি নিয়া এই দীর্ঘিকা খনন করা হয়। ইহার চারিপাড়ে চারিটী গ্রাম অবস্থিতি আছে—পশ্চিমপাড় মাধবপাশা, উত্তরপাড় পাংশা, দক্ষিণপাড় শোলনা ও ফুলতলা এবং পূর্ব্বপাড়ে কলাডেমা গ্রাম অবস্থিতি আছে। ইংরেজী ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে, বঙ্গাব্দ ১১৮৭ সালে উক্ত দীঘি খনিত হয়। রাণী দুর্গাবতীর নামানুসারে উক্ত দীঘি দুর্গাসাগর নামে বিখ্যাত আছে। বরিশাল জিলায় এত বড় প্রকাণ্ড দীঘি আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই দুর্গাসাগরের পশ্চিমপাড়ে একখানি ইষ্টক নির্ম্মিত বড় পাকা ঘাট আছে। কত কাল গিয়াছে এক্ষণও চতুর্দ্দিকের পাড়গুলি যেন এক একটী ক্ষুদ্রতম পাহাড়ের ন্যায় দৃষ্ট হইয়া থাকে।

দুর্গাসাগর উৎসর্গ।

১১৮৮ সালে দুর্গাসাগর উৎসর্গ করা হয়। এই উৎসর্গ উপলক্ষে চন্দ্রদ্বীপের সমস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং বিক্রমপুর পরগণা ও বঙ্গের বিভিন্ন প্রদেশের পণ্ডিতগণ এবং মিথিলা ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের দ্রাবিড়, কর্ণাট, পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব্বস্থলী, ভাটপাড়া ও নবদ্বীপ, কাশী, আগ্রা প্রভৃতি প্রায় সমগ্র ভারতের পণ্ডিতমণ্ডলী নিমন্ত্রিত হইয়া মাধবপাশা রাজধানীতে আগমন করেন। পণ্ডিতমণ্ডলীর আগমনে ও অন্যান্য দেশীয় ঘটক, স্বর্ণামাভ্য সম্ভ্রান্ত, কুলীন, কুলজ ও ভট্ট প্রভৃতির আগমনে তৎকালীন রাজধানী অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল, এরূপ দৃশ্য রাজবাড়ী আর কখনও ঘটে নাই। বিধাতার ইচ্ছা খণ্ডিবার নহে, হঠাৎ রাজপরিবারের কোন বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মৃত্যু হয়; তাহাতে রাজা জয়নারায়ণের অশৌচ হইয়া, উহা একমাসকাল পালন করিতে হয়। ইহাতে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে যে সকল

লোকসমূহ আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের দেশে গিয়া পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িল। যেহেতু বর্ত্তমানকালের ন্যায় তৎকালে এতদ্দেশে কোন রেল ষ্টীমারের বন্দোবস্ত ছিল না; সুতরাং নাবালক রাজা মহাবিপদে পড়িলেন এবং বাধ্য হইয়া সমস্ত লোকজনকে মাসাধিককাল যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া আহার ও বাসস্থান প্রদান করিলেন। অবশেষে নূতন পুণ্যাহ তিথিতে উৎসর্গ কার্য্য সমাধা করিতে হইয়াছিল এবং পণ্ডিতগণ একমাসকাল চন্দ্রদ্বীপে থাকিয়া উপযুক্ত বিদয় প্রাপ্তে সকলে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। উক্ত দুর্গাসাগর খনন ও উহার উৎসর্গ কার্য্যে তৎকালীন তিন লক্ষ টাকার উপরে ব্যয় হয় এবং ইহাতে সরকারী ধনাগার প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল। বিশেষ তৎকালে রাজকর্ম্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতায় আয়ের পথ একেবারে কমিয়া গিয়াছিল; সুতরাং চন্দ্রদ্বীপের সৌভাগ্য-সূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইতে চলিয়াছিল।

দুর্গাসাগরে বহুদিন যাবৎ ধাপ হইয়া নিবিড় জঙ্গলে আবৃত হইয়াছিল। বরিশাল ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ১২০০ শত টাকা ব্যয় করিয়া, উক্ত ধাপ কাটিয়া দীঘিটী পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। দুর্গাসাগরে বড় বড় মৎস্য আছে, উহা এক একটী ছোট কুম্ভীরের মত।

চন্দ্রদ্বীপে রাজা জয়নারায়ণের রাজত্বকালে মহানুভব লর্ড কর্ণওয়ালিস ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন। ইংরেজী ১৭৯০ সনে এবং বাঙ্গলা ১১৯৭ সালে প্রথম জমিদারী বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করেন। তৎপর ১৭৯৩ সালের ১লা মে বাঙ্গলা ১২০০ সালের ২১শে বৈশাখ তারিখে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিষয়ক ১৭৯৩ সালের ১ আইন জারী করেন। উক্ত বন্দোবস্ত আরম্ভ হওয়ার পর হইতে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য হইতে কোটালীপাড়া, ইদিলপুর,

সুলতানাবাদ, আজিমপুর, বোজরোগ উমেদপুর, নাজিরপুর প্রভৃতি নামিক ৩৯টী পরগণা সৃষ্টি হইয়া, ঐ পরগণাগুলি বাহির হইয়া যায় এবং লর্ড কর্ণওয়ালিস বিভিন্ন মালিকগণ সহিত তাহার বন্দোবস্ত করেন। রাজা শিবনারায়ণের মৃত্যুকালে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে ১৫ লক্ষ টাকা আয় ছিল। তৎপর সমস্ত পরগণা বাহির হইয়া গেলে চন্দ্রদ্বীপের জমিদারীতে যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহার জমিদারীতে ৮২৫৬২৸৶৪॥ পাই এবং তদধীন ৭৩খানা তালুকে ৫৮১০৪॥৶৮॥ পাই, একজাই সম্পত্তিতে ১৪০৬৬৭৷৵১ পাই রাজস্ব ধার্য্যে লর্ড কর্ণওয়ালিস রাজা জয়নারায়ণের সহিত জমিদারী বন্দোবস্ত করিলেন। তৎকালীন নাবালক রাজার যে সকল কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহার অধিকাংশই অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত এবং বিশ্বাসবিহীন ছিল। পরগণাগুলি বাহির হইয়া যাওয়ার সময়ে রাজার পক্ষ হইয়া কেহ উর্দ্ধতন কর্ত্তৃপক্ষ নিকট দরবার করিবে এমন লোক ছিল না, সকল কর্ম্মচারীই আপন আপন উদর পূর্ণ করার চেষ্টায় ব্যস্ত ছিল; সুতরাং নানা কারণে চন্দ্রদ্বীপের গৌরব-রবি ধীরে ধীরে অস্তমিত হইতে লাগিল। *

চন্দ্রদ্বীপ নীলাম।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নীলামের আইন জারী করিলেন। নীলামের ভয়ে খাজানা মাথায় লইয়া অবধারিত দিবসের পূর্ব্বে প্রাণপণে কালেক্টর সাহেবের হস্তে অর্পণ করা তখন এ দেশীয় লোকদিগের নিতান্ত অনভ্যস্ত ছিল। বিশেষতঃ তৎকালীয় রাজার বিশ্বাসবিহীন কর্ম্মচারিগণ অতি অধার্ম্মিক ও দুষ্টাশয় ছিল; সুতরাং রাজার সরকারী খাজানা বাকী পড়িতে

* রাজা জয়নারায়ণের সময় লাখেরাজ খানাবাড়ীর সৃষ্ট হয়, তাহা বর্ত্তমান সেটেলমেন্টে ১৭ বি, লাখেরাজ খানাবাড়ী নামে রেকর্ড হইয়াছে।

লাগিল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এইভাবে আইন বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন যে, যে জমিদারীর রাজস্ব যত পরিমাণ বাকী পড়িবে, সেই পরিমাণের টাকা ঐ বাকীপড়া বিত্তের যতখানি অংশ বিক্রয় করিলে উঠিতে পারে তাহাই প্রথম বিক্রয় হইবে, অল্প বাকীর জন্য ষোল আনা জমিদারী বিক্রয় হইত না। তদনুসারে ১২০০ সালের শেষভাগে চন্দ্রদ্বীপের ⁄১৭।⁄⁄ ক্রান্তি সর্ব্ব প্রথমে ঢাকা কালেক্টরীতে নীলাম হয়, তৎকালীন বাখরগঞ্জ জিলার সৃষ্টি হয় নাই; এই প্রদেশ ঢাকার কালেক্টরীর অধীন ছিল। উক্ত অংশ নীলামে উঠিলে বর্ত্তমান বরিশালস্থ জমিদার বাবু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্ম্মণের পূর্ব্ববর্ত্তী তৎকালীন ঢাকা সহর নিবাসী বাবু দলসিংহ বর্ম্মণ উহা ক্রয় করেন। পুনরায় ১২০২ সালে আবার ৵১২॥ গণ্ডা অংশ ঐ ভাবে নীলাম হইলে ঢাকা সহরবাসী মিঃ জন্ পেনেটি সাহেব তাহা ক্রয় করেন। ১২০৪ সালে উহার রকম ৵১৭॥ গণ্ডা অংশ নীলাম হইলে তাহাও উক্ত পেনেটি সাহেব ক্রয় করেন। রাজার মাতুল প্রভৃতি নৈকট্য আত্মীয়গণ তাঁহার কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহাদের প্রতি রাজস্ব দেওয়ার ভার ছিল; তাহাদের প্রবঞ্চনাতেই রাজার ঐ সকল জমিদরৌ বিক্রীত হইয়া যায়। রাজা খাজানা দাখিল জন্য যে সকল টাকা ঐ সকল কর্ম্মচারীকে দিতেন, তাহারা কালেক্টরীতে উক্ত টাকা জমা না দিয়া আপনারা বিভাগ করিয়া লইতেন। তাহারা নাবালক রাজা ও রাজমাতাকে বুঝাইতেন তাঁহাদের কোন চিন্তা করিবার কারণ নাই।

উল্লিখিত অংশ সকল বিক্রীত হইয়া যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাও ঐ কারণে একবারে বিক্রয় হইয়া গেল। ১২০৬ সালে অবশিষ্ট ॥১২॥⁄⁄ ক্রান্তি অংশ একেবারে নীলাম হইলে রাজবাড়ীর দরজার বাজারের রামমাণিক্য মুদী উহা নীলাম খরিদ করেন। তৎপর রামমাণিক্যের ভ্রাতা

রাধামাধব মুদী উহার /০ আনি অংশ মাত্র রাখিয়া ।/১২॥// ক্রান্তি অংশ রাজাকে দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু রাজা তাঁহার দুষ্টাশয় কর্ম্মচারিগণের পরামর্শে তাহাতে অসম্মত হইলেন। রাজার আত্মীয় ও কর্ম্মচারিগণ রাজা ও রাজমাতাকে বুঝাইলেন যে, মুদীর সহিত সরিকী করা অপমানজনক। বিশেষ মুদী যে টাকাদ্বারা নীলাম খরিদ করিয়াছে, ঐ টাকাও রাজভাণ্ডারের টাকা, মুদী যাহা রাখিবে তাহাই সে অন্যায় মতে রাখিবে।

অবশেষে রাজা জয়নারায়ণ রামমাণিক্য মুদীর নামে ঢাকার সদর দেওয়ানী আদালতে নালিশ উত্থাপন করিয়া ডিক্রীপ্রাপ্ত হন; কিন্তু মুদীর পক্ষ হইতে সুপ্রিম কোর্টে উহার আপীল করিলে, নিম্ন আদালতের হুকুম রহিত হয়। পরে রাজা জয়নারায়ণ বিলাতে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করেন। ইতিমধ্যে রাণী দুর্গাবতীর মৃত্যু হয়; শোকে ও দুঃখে তিনি অচিরকাল মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হন।

রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যু সময় তৎপুত্র নৃসিংহনারায়ণ নাবালক ছিলেন। রাণী করুণাময়ী এই অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুপুত্র লইয়া মহাবিপদে পতিত হইলেন; তখন অনন্যোপায় হইয়া হোসেনপুর হইতে বৃদ্ধ কর্ম্মচারী গঙ্গাগোবিন্দ বক্সী মহাশয়কে আনিয়া প্রধান কর্ম্মচারী পদে নিযুক্ত করিলেন। রাজা জয়নারায়ণ রামমাণিক্যের নামে ঢাকার সদর দেওয়ানী আদালতে যে মোকদ্দমা স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; তাহা এই—রাজা জয়নারায়ণের পক্ষ হইতে নীলামের অব্যবহিত পরেই বলা হইল যে, রামমাণিক্য রাজার বিনামদার মাত্র; সুতরাং তিনি সর্ব্বজন সমক্ষে রামমাণিক্যকে উক্ত বেনামী খরিদ সম্বন্ধে মুক্তিপত্র রেজিষ্টরী করিয়া দিতে বলেন—তাহাতে কয়েকদিন বাদানুবাদের পর রাম-

মাণিক্য মুক্তিপত্র রেজিষ্টরী করিয়া দিতে স্বীকার হইলে, রাজার প্রধান কর্ম্মচারী রামমাণিক্যকে সহ ঢাকা সদরে গিয়া উক্ত মুক্তিপত্র রেজিষ্টরী করেন এবং উক্ত রেজিষ্টরীর পর রামমাণিক্য মাধবপাশা আসিয়া কুচক্রী লোকের পরামর্শে উক্ত রেজিষ্টরী করা অস্বীকার করিয়া পুনরায় স্বনামা খরিদ বলিয়া দাবী করেন, তাহাতে রাজা জয়নারায়ণ বাধ্য হইয়া ঢাকার সদর দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়াছিলেন।

উল্লিখিত মুক্তিপত্র ১৭৯৯ সালে ঢাকা সদরে রেজিষ্টরী হইয়াছিল। তৎকালীন বর্ত্তমান সাহেবগঞ্জের নিকট বাখরগঞ্জেও একটী রেজিষ্টরী আফিস ছিল; ইহাতে রামমাণিক্যের পক্ষে উক্ত মোকদ্দমায় এই ভাবে উত্তরদায়ক হন যে, মাধবপাশার নিকটবর্ত্তী বাখরগঞ্জে রেজিষ্টরী আফিস থাকিতে দূরবর্ত্তী ঢাকায় গিয়া দলীল রেজিষ্টরী করার কোন প্রয়োজন ছিল না; সুতরাং উহা কৃত্রিম। ঢাকার দেওয়ানী আদালত এই বর্ণনার কোন সারবত্তা উপলব্ধি না করিয়া রাজার সপক্ষে মোকদ্দমা ডিক্রী দেন; কিন্তু কলিকাতার সুপ্রিমকোর্ট রামমাণিক্যের উপরোক্ত অজুহাতকে ঠিক মনে করিয়া মুক্তিপত্রখানি সন্দিগ্ধ মনে করিয়া রাজার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা ডিসমিস করেন। অতঃপর রাজা জয়নারায়ণ অনতিকাল মধ্যে উক্ত সুপ্রিম-কোর্টের নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে বিলাতের প্রিভিকাউন্সিলে আপীল দায়ের করেন।

রাজা জয়নারায়ণের মৃত্যুর পর রাণী করুণাময়ী নাবালক পুত্র নিয়া যেরূপ বিপদে পড়িলেন, তাহাতে তিনি প্রিভিকাউন্সিলের আপীলের কোন সংবাদাদি নিতে পারিলেন না; বিশেষ তৎকালে প্রিভিকাউন্সীলের আপীল-গুলি অন্যূন তিন চারি বৎসরের কম নিষ্পত্তি হইত না। বিপক্ষদল হইতে

কুচক্রীরা এইরূপ জনরব তুলিলেন যে, রাজা প্রভিকাউন্সীলের বিচারে পরাজিত হইয়া অনর্থক খরচার দায়ী হইয়াছেন। এই জনরবের অল্পদিন পরেই বিলাত হইতে সংবাদ আসিল, রাজা মোকদ্দমায় জয় লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার বিনামী খরিদা স্বত্বই সাব্যস্ত হইয়াছে। বিপক্ষদল এই সংবাদ প্রথম অবগত হইল এবং রাজবাড়ী সংবাদ পৌছিবার পূর্ব্বেই চতুরতাক্রমে নিষ্পত্তির কথা তুলিলেন। এদিকে রাণী করুণাময়ী এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক রাজাকে কর্ম্মচারিগণ এইভাবে বুঝাইলেন যে, "সর্ব্বস্ব যাওয়া অপেক্ষা বরং কিছু সম্পত্তি নিয়া থাকাও ভাল।" সুতরাং নিষ্পত্তির প্রস্তাব স্থিরীকৃত হইরা অচীরে ছোলেনামা দাখিল করা সাব্যস্ত হইল; উক্ত নিষ্পত্তির মর্ম্মমতে রামমাণিক্য ॥১২॥// ক্রান্তি জমিদারী হইতে রাজার দুই স্ত্রী রাণী রাজেশ্বরী ও রাণী অন্নপূর্ণার নামে দুইখানি তালুক লিখিয়া দিলেন এবং অত্যল্পকাল মধ্যে ছোলেনামা দাখিল করা হইল। উক্ত ছোলেনামা দাখিলের অব্যবহিত পরেই বিলাত আপীলের সংবাদ রাজার নিকট ঘোষণা করা হইল। রাজপরিবার এই সংবাদ শ্রবণ মাত্র শিরে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

রাজা নৃসিংহনারায়ণের মৃত্যু।

রাজা নৃসিংহনারায়ণ দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন এবং অল্প বয়স্ক হইলেও সর্ব্বদাই নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিতেন। তাঁহার মাতৃ আদেশে অল্প বয়সেই তিনি ক্রমিক দুটী বিবাহ করেন; উঁহার এক স্ত্রীর নাম ছিল, রাণী অন্নপূর্ণা এবং অপর স্ত্রীর নাম ছিল, রাণী রাজেশ্বরী। বিলাতের আপীলের

সংবাদ শ্রবণ এবং কুচক্রীদিগের চক্রান্তে সম্পত্তি উর্দ্ধতন বিচার আদালতে পাইয়াও তাহাহইতে বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি কারণে নৃসিংহনারায়ণ অতিরিক্ত চিন্তায় ক্রমে শয্যাশায়ী হইলেন এবং হা হতোস্মি! কি হইল! কি করিলাম! এই প্রকার দুর্ভাবনায় দিনের পর দিন ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে লাগিলেন এবং অচিরাৎ তাঁহার দেহপিঞ্জর হইতে জীবন-বায়ু বহির্গত হইয়া তাঁহাকে সকল চিন্তা হইতে উদ্ধার করিল।

রাজা নৃসিংহনারায়ণের মৃত্যুর পর পুত্রশোকে রাণী করুণাময়ী অতি কাতরা হইয়া কুচক্রীদিগের চক্রান্ত বর্ণনা করতঃ তৎপ্রতিকারকল্পে গবর্ণমেণ্টে একখানি আবেদনপত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট উহার আর কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

রাজা বীরসিংহনারায়ণ ও রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ।

রাণী করুণাময়ীর মৃত্যুর পরে রাণী রাজেশ্বরী বীরসিংহনারায়ণ নামে একটী এবং রাণী অন্নপূর্ণা দেবেন্দ্রনারায়ণ নামে একটী দত্তক পুত্র গ্রহণ করেন। উক্ত বীরসিংহনারায়ণ রায় অদ্যাপি জীবিত আছেন। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায় একজন খ্যাতনামা শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন। তাঁহার এক প্রকাণ্ড ছাতা ছিল, তিনি উক্ত ছাতাসহ দ্বিতল অট্টালিকা হইতে লম্ফ দিয়া ভূতলে পতিত হইতেন; তিনি শক্তিশালী পুরুষ হইলেও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারেন নাই। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ না হইতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। উক্ত দেবেন্দ্রনারায়ণের দুই পুত্র; উপেন্দ্রনারায়ণ এবং ভূপালনারয়াণ। ইঁহারা বর্ত্তমান আছেন, উপেন্দ্রনারায়ণকে সাধারণতঃ গোপাল রাজা বলে।

বর্ত্তমান পরগণার ১৭২০নং তৌজীর অধীন দুইখানি সিকিমী তালুক এবং ১৭ বি, নং রাজা জয়নারায়ণ নামিক নিষ্কর লাখেরাজ থানাবাড়ী এই মাত্র সম্পত্তি বর্ত্তমান রাজাদের ছিল। তাহারও ৷৷০ আনি (বড় রাজা বীরসিংহনারায়ণের স্বত্ব) কলসকাঠীর জমিদার ৺ বরদাকান্ত রায় নীলাম খরিদ করেন। বহুদিন যাবৎ ঐ সম্পত্তি উক্ত বরদাকান্ত রায় কি তৎপুত্র বিশ্বেশ্বর রায়চোধুরী দখল করিতে সাহসী হন নাই; অবশেষে পুরুষানুক্রমে রাজান্নে পরিপুষ্ট রাজবাড়ীর নিকটস্থ শ্রীনগর (বাড়ৈখালী) নিবাসী জনৈক কাঞ্জবল্লীর আগ্রহে, চেষ্টায় ও যত্নে তিনি কতক সম্পত্তি দখল করিয়াছিলেন। অবশেষে ৩।৪ বৎসর গত হইল, দেওয়ানী আদালতে বণ্টকের মোকদ্দমাক্রমে বণ্টক করিয়া নিয়াছেন।

রাজা বীরসিংহনারায়ণ রায় বৃদ্ধাবস্থায় বিশেষ হীনাবস্থাপ্রযুক্ত প্রায়ই বাড়ীর বাহির হন না। তাঁহার একমাত্র পুত্র যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় শিক্ষিত এবং বিনয়ী। তিনি বাঙ্গালা, ইংরেজী ও সংস্কৃত কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছেন এবং রাজা উপেন্দ্রনারায়ণ ও ভূপালনারায়ণ বিনয়ী এবং স্বধর্ম্মনিরত। ইঁহাদের সহিত কেহ আলাপ করিলে অতি বিনয়ের সহিত মৃদু মধুর বচনে লোকের কথার উত্তর দিয়া থাকেন। ইঁহারা উভয়েই সাধারণভাবে ইংরেজী বাঙ্গালা ও সংস্কৃত লিখিতে পড়িতে ও বলিতে পারেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিবিধ বিবরণ।

(অভিষিক্ত রাজা)।

বঙ্গদেশীয় প্রাচীন দ্বাদশ ভৌমিক মধ্যে নয়জন হিন্দু ছিলেন। তন্মধ্যে চন্দ্রদ্বীপের রাজা যথাশাস্ত্রবিধানে অভিষিক্ত (Caranation) হইয়া সিংহাসনে আরোহণ করিতেন। দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম নরপতি মহারাজ প্রতাপাদিত্য তাঁহার ধুমঘাটের রাজধানীতে একবার মাত্র অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন চন্দ্রদ্বীপের রাজা ভিন্ন আর কেহই অভিষিক্ত হইতেননা।

পূর্ণ স্বাধীন অবস্থা।

১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে ও বঙ্গাব্দ ৯০৮১ সালে মুসলমানগণ বাখরগঞ্জ অধিকার করেন, তৎপূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ অধীশ্বর পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন এবং রাজা দনুজমর্দ্দন দে স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন। রাজা প্রতাপনারায়ণের সময় হইতে অধীনতা আরম্ভ হয়।

নাম মাত্র করদ অবস্থা।

মুসলমান কর্ত্তৃক বাখরগঞ্জ অধিকৃত হওয়ার পরেও চন্দ্রদ্বীপ নামে করদ থাকিয়া কার্য্যতঃ স্বাধীন ছিল; দিল্লী হইতে কখন কোন ফৌজদার আসিলে তখন তাঁহাকে কিছু কর প্রদান করা হইত; বাদসাহের লোক চলিয়া গেলে পুনরায় স্বাধীনভাবেই কাজকর্ম্ম চলিত। দিল্লীর বাদসাহের পক্ষ হইতে

৫।৭ বৎসর অন্তর সুদূর চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের সংবাদ নেওয়া হইত। কখন কখন দিল্লী হইতে ফৌজ আসিলে রাজার লোকজন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইত; সুতরাং তাহারা কিছুই করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্ণমনে দিল্লী চলিয়া যাইত। *

দেওয়ান সারাই আচার্য্য।

বরিশাল টাউনের তিন মাইল পশ্চিমে রূপাতলী গ্রামে সারাই আচার্য্যের আবাস ভূমি ছিল। ইঁনি মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ রায়ের শেষকালে এবং রাজা রামচন্দ্রের প্রথম অবস্থায় দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন; ইঁনি অত্যন্ত দুঃসাহসী ও নির্ভীক লোক বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। এই আচার্য্য-বংশের পরই রহমতপুরের দেওয়ানবংশ চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকার অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

---

* ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে র‍্যালফ ফিচ (Ralph fitch) নামক জনৈক ইংরেজ এ দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন—শ্রীপুরের অধীশ্বর চাঁদ রায় প্রভৃতি সকলে একত্র মিলিত হইয়া, আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তখন এ দেশে নদ-নদী ও দ্বীপ বহুল থাকাতে গোলযোগ দেখিলে বাঙ্গালীরা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গিয়া আত্মরক্ষা করিত। মিঃ ফিচ বলেন—From Bacola I Went to Sreepur which Standeth upon the river of Ganges the king is called Chand Ray they be all hereabouts rebels against their king zebaldim Echebar, for here somany rivers & Islands that they flee from one to another whireby his harsemen Cannat prevail against them, (Travels & Relph Fitch by J Horton Ryley 118-119.

দেওয়ান রহমতপুরের চক্রবর্ত্তীবংশ।

দ্বাদশ নৃপতি প্রতাপনারায়ণ একদা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে কলিকাতা গিয়া তথা হইতে চন্দ্রদ্বীপে ফিরিতেছিলেন, তৎকালীন কোন রেল ষ্টীমার ছিল না; রাজা নৌকাযোগে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে বর্ত্তমান ২৪ পরগণা জিলায় কাঁচরাপাড়া নামক গ্রাম অতিক্রম করিয়া আসিতেছিলেন; কার্য্য-বশতঃ রাজার নৌকা নদীতীরে সংলগ্ন হইলে, তিনি এক যুবক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহার পরিচয়াদি গ্রহণ করিয়া যুবক যে একজন বুদ্ধিমান্ ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি তাহা বুঝিতে পারিলেন। রাজার ইচ্ছা হইল, যুবক তাঁহার সহিত আসিলে তিনি তাহাকে চন্দ্রদ্বীপে নিয়া আসেন। পরিশেষে রাজার অভিপ্রায় মতে ঐ ব্রাহ্মণ যুবক রাজার সহিত মাধবপাশা আগমন করেন এবং রাজকার্য্যে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই দেওয়ানের পদ লাভ করেন। ইঁনিই রহমতপুরের চক্রবর্ত্তীবংশীয় আদি-পুরুষ রামনারায়ণ চক্রবর্ত্তী; ইঁনি রাজার অনুরোধে একাধিকবার দিল্লী গমন করিয়াছিলেন। রামনারায়ণের পুত্র রূপদেব ও রঘুদেব, তাঁহারা তেমন প্রতিভাশালী ছিলেন না। এই দেওয়ানবংশে রামনারায়ণের পরে তাঁহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র রামজীবনের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ধর্ম্মভীরু ও যোগ্যতর ব্যক্তি ছিলেন, তিনি রাজা শিবনারায়ণের দেওয়ান ছিলেন। এই বংশের অষ্টমপুরুষে স্বর্গীয় বরদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী জন্মগ্রহণ করেন। সুরেন্দ্র, যোগেন্দ্র ও রাজেন্দ্রনাথ নামে তাঁহার তিনটী পুত্র বর্ত্তমান আছে। রহমতপুরে ইঁহাদের দুইখানি বাড়ী আছে, তাহা নূতনবাড়ী ও মাঝবাড়ী বলিয়া খ্যাত। চন্দ্রদ্বীপ রাজানুগ্রহে ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ যে প্রভূত ভূ-সম্পত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তদ্দ্বারা বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ কালেক্টরীর ১৭৫২, ১৭৫৩, ১৭৫৫,

২৬৯৮, ১৭২৯, ১৪৪৯নং তৌজী সৃষ্টি হইয়াছে; ইহা এক একটী প্রকাণ্ড তালুক। রামজীবনের পুত্র চন্দ্রশেখর। এই চন্দ্রশেখর নামেই ১৭২৯নং চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী নামিক তালুকের সৃষ্টি হইয়াছে। রহমতপুরের নূতন বাটীস্থ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ চক্রবর্ত্তী এ জিলায় একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সেবী বলিয়া বিখ্যাত। ‡

রাজধানী সম্বন্ধীয় প্রমাণ।

বরিশাল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা সভায় যখন চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পঠিত হইয়াছিল, তখন কোন কোন সভ্য উক্ত প্রবন্ধ লিখিত বিশারিকাঠী, ক্ষুদ্রকাঠী ও হোসেনপুর সম্বন্ধে কোন প্রমাণ না থাকার কথা বলিয়াছিলেন, তজ্জন্য অতি প্রাচীন কায়স্থকারিকা হইতে নিম্নলিখিত সংস্কৃত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল;—

কন্দর্পোপম কন্দর্পো জগদানন্দকাত্মজঃ।
মহাধনুর্দ্ধরো মানী মহারথো মহাশূরঃ॥

---

‡ রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় যখন জাহাপুর নদীর পাড় ক্ষুদ্রকাঠীতে রাজধানী স্থাপনের জন্য কিছুদিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তৎকালীন বর্ত্তমান রহমতপুর খালের উত্তরপাড়ে ভীষণ অরণ্যাবৃত স্থানে রহমত উল্লা নামিক এক মুসলমান দস্যু সরদার বাস করিত। ইহার দলে ছোট বড় অনেক দস্যু ছিল। ইহারা নিকটস্থ নদীতে সর্ব্বদা ডাকাতি করিত। উহাদের আবাসভূমি ভীষণ অরণ্যাবৃত স্থানে ১৮ খান খড়্গ ছিল, উহাতে নরবলি দেওয়া হইত॥ ইহারা ডাকাতির সময় ধৃত ব্যক্তিগণকে নৃশংসভাবে হত্যা করিত। রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় ক্ষুদ্রকাঠী আসিয়াই এই দস্যু-দলপতিকে সবল-বলে নিহত করেন। রহমত উল্লা দস্যুর নামানুসারে এই গ্রামের নাম রহমতপুর বলিয়া খ্যাত আছে। বর্ত্তমানে যে খাল দৃষ্ট হয়, তৎকালে উহার পশ্চিমপাড়কে গো-শাসন ও পূর্ব্ব উত্তরপাড়কে রহমতপুর বলিত।

রাজধানী সম্বন্ধীয় প্রমাণ।

অক্ষৌহিণী-পতির্বীরঃ সব্য-সাচী সমো রণে।
যুদ্ধপ্রিয়ো মহাচক্রী যবনারির্মহাবলঃ
যবনাধিপতিং গাজীং রণে ব্যাপ্যাদয়ৎ কিল।
মগবীর্য্যং তথা খর্ব্বমকরোৎ সঃ নৃপোত্তমঃ।
স্থাপয়া মাসপুরঞ্চ বাসুরীকাটি সংজ্ঞকম্॥
তথা মাধবপাশাঞ্চ ক্ষুদ্রকাঠীং তথৈব চ
অতাড়য়ৎ যবনান্ স হোসেনাখ্য পুরাত্তথা
রথীনাঞ্চ রথী শূরঃ সর্ব্ব শাস্ত্র-বিশারদঃ॥ *

মাধবপাশা সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে;—চতুর্ব্বিধ সহস্রাণি প্রথমং কলিযুগস্য চ। শমিষ্যন্তি যদা বিপ্রাশ্চন্দ্রদ্বীপস্তদা মহৎ। পত্তনঞ্চ নদীপার্শ্বে মাধবপাশং ভবিষ্যতি। মাধবপাশ পত্তনস্থা লোকধর্ম্মকৃতা যদা। স্থাস্যতি গ্রামপার্শ্বে চ তথা মাধব দেবকঃ॥

সুতরাং রাজা কন্দর্পনারায়ণ রায় যে বিশারীকাঠী, ক্ষুদ্রকাঠী, হোসেনপুর ও মাধবপাশায় ক্রমিক রাজধানী পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাহা অকাট্য-রূপে প্রমাণিত হইল।

রাজা রামচন্দ্রের প্রশংসা।

রাজা রামচন্দ্র যে একজন বুদ্ধিমান্ ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ রাজা ছিলেন, তৎ-সম্বন্ধে পর্টুগীজ পাদরিগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ধর্ম্ম প্রচার জন্য ফন্‌সেকো, ফর্ণাণ্ডেজ, কর্ডয়েস্ ও সোসা নামিক চারিজন

---

* ইহা ব্যতীত ইলিয়ট ৩য় ভলুম ৪১২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য, তাহাতে হোসেনপুরের যুদ্ধ বিবরণ সন্নিবেশিত আছে।

পাদরী রাজা রামচন্দ্রের আমলে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ১৫৯৮—৯৯ খৃষ্টাব্দে মধ্যে বাক্‌লায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজা রামচন্দ্র তাঁহাদিগকে যেরূপ আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাহাতে পাদরিগণ মধ্যে ফন্‌সেকো গোয়ার প্রধান পাদরী "পাইমেণ্টের" নিকট লিখিয়া পাঠান, পাইমেণ্ট স্বীয় মন্তব্যসহ উহা ১৬০১—২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। "পার-ডি-জেরির তৎকৃত "ভিসন্টিইস্ ওরিয়াণ্টাল" নামক গ্রন্থে উহা উল্লেখ করিয়াছেন। ফন্‌সেকো বলিয়াছিলেন—"আমরা আপনার শ্বশুর চ্যাণ্ডিকান (যশোহর) অধিপতির রাজ্যে গমন করিতেছি। আমাদের ইচ্ছা আপনার রাজ্য মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার ও গীর্জ্জা স্থাপন কার্য্যে কোনরূপ ব্যাঘাত না ঘটে, তৎপ্রতি আপনার মনোযোগ আকর্ষিত হয়।" মিঃ বেভারিজ তৎকৃত বাখরগঞ্জের ইতিহাসের ৩০—৩১ পৃষ্ঠায় এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

সীমা নির্ণয় সম্বন্ধীয় আপত্তির খণ্ডন।

এই পুস্তকের প্রথমভাগে সীমা নির্ণয় নামে যে অধ্যায় লিখিত হইয়াছে তাহার উত্তর সীমানায় বর্ত্তমান ফরিদপুরের কতক অংশ পুরাকালে চন্দ্রদ্বীপের অধীন ছিল, এই বিষয় নিয়া কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি আপত্তি করিয়াছিলেন, তজ্জন্য নিম্নে উক্ত আপত্তির খণ্ডন করা গেল :—

কুশদ্বীপোহি চোত্তরে।

বাদসাহ আকবরের প্রধান রাজস্ব-সচিব রাজা তোড়লমল্ল বঙ্গদেশকে উনিশটী সরকারে বিভক্ত করেন ; যথা—(১) সরকার জেন্নতাবাদ, (২) সরকার তাণ্ডা, (৩) সরকার ফতেয়াবাদ, (৪) সরকার মামুদাবাদ, (৫) সরকার

থানী কেতাবাদ, (৬) সরকার বাক্‌লা, (৭) সরকার পূর্ণিয়া, (৮) সরকার তাজপুর, (৯) সরকার ঘোড়াঘাট, (১০) সরকার পিঞ্জিরা, (১১) সরকার বারকাবাদ, (১২) সরকার বাজুহা (১৩) সরকার সোণারগা, (১৪) সরকার শিলেট (শ্রীহট্ট), (১৫) সরকার চট্টগ্রাম, (১৬) সরকার সেরিফাবাদ, (১৭) সরকার সেলিমাবাদ, (১৮) সরকার সাতগা, (১৯) সরকার মাদারণ। ইহা ব্যতীত বিহারে সরকার বিহার, মুঙ্গের চম্পারণ, হাজীপুর, সারণ, ত্রিহুত, রোটাশ এই সাতভাগে বিভক্ত ছিল। উপরোক্ত ৩নং সরকার ফতেহাবাদ মধ্যে ৩১টী মহল ছিল ; যথা—(১) জয়শির, (২) ফুলচৌল, (৩) চরণ লক্ষ্মী, (৪) কুশদিয়া ইত্যাদি। উক্ত কুশদিয়া বা বর্ত্তমান কুশন্দিয়া যে কুশদ্বীপের অপভ্রংশ তদ্বিষয় কোন সন্দেহ নাই। অতএব পুরাকালে যে চন্দ্রদ্বীপের সীমানা উক্ত কুশদিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা অসম্ভব বলিয়া মনে করা সঙ্গত নহে। উক্ত কুশন্দিয়া বর্ত্তমান ফরিদপুর জিলার অন্তঃপাতী গোপাল-গঞ্জ থানার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ফরিদপুরের ইম্পিরিয়াল গেজেটীয়ার দেখিলে গোপীনাথপুর নামে একটী পরগণা যে পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপভুক্ত ছিল, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত বরিশাল কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত নিম্নলিখিত পরগণাস্থিত অধিকাংশ জনপদ নিয়া বর্ত্তমান ফরিদ-পুর জিলা গঠন হইয়াছে। পরগণাগুলির নাম যথা—হবিবপুর, ইদিলপুর, ইদ্রাকপুর, কাদিরাবাদ, কাসীমপুর-শেলাপট্টি, রামনগর, সফিপুর কালা ইত্যাদি। এই সকল পরগণার রাজস্ব, বিভাগ অনুসারে বর্ত্তমানে বরিশাল ও ফরিদপুর দাখিল হইয়া থাকে। মাদারীপুর এবং কোটালীপাড় পরগণা চন্দ্রদ্বীপভুক্ত থাকার বিশিষ্ট প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্ব্বে কোটালীপাড় চন্দ্রদ্বীপ হইতে বিভিন্ন হইয়া নূতন

পরগণায় পরিণত হয়। বর্ত্তমান নোয়াখালী, খুলনা ও ফরিদপুরের কতক অংশ চন্দ্রদ্বীপের প্রাথমিক কাল হইতে যে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল, লেখক এমন কথা কাহাকেও স্বীকার করিতে বলেন না। নোয়াখালী হইতে লক্ষ্মণমাণিক্যকে বন্দী করিয়া আনার পর কিছুদিন ভুলুয়া রাজা চন্দ্রদ্বীপ রাজার অধীনস্থ ছিল এবং অল্পকাল পরেই ভুলুয়া উক্ত অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়াছিল। পুরাকালীয় চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের কতিপয় স্থান না নিলে ফরিদপুর ও খুলনা জিলা আদৌ গঠন হইতে পারিত না; ইহা প্রতিপাদন জন্য কোন প্রমাণের আবশ্যক হইবে না। বর্ত্তমান ফরিদপুর জিলায় যেমন বরিশালস্থ হবিবপুর পরগণা প্রভৃতির কতকাংশ দেখা যায়, তদ্রূপ খুলনা জেলাও সেলিমাবাদ প্রভৃতি কতিপয় পরগণা বরিশাল হইতে গিয়া খুলনা জিলাভুক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, সেলিমাবাদ পরগণার সহিত চন্দ্রদ্বীপের আদৌ কোন সম্পর্ক ছিল না; কিন্তু রাজা রামচন্দ্রের আমলে সেলিমাবাদ মাত্র নদীগর্ভ হইতে অল্পে অল্পে বিল সৃজন করিয়াছিল, তখনও কোন মনুষ্যবাসের উপযুক্ত হইয়াছিল না; সুতরাং পরোক্ষভাবে উহা চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের সীমাভুক্তই ছিল। বর্ত্তমানে সেলিমাবাদের অধিকাংশ স্থান চন্দ্রদ্বীপের সীমানা মধ্যেও দৃষ্ট হইয়া থাকে; তাহার কারণ এই যে, উক্ত পরগণার ভূমি উত্থিতের পর উহার মালিকগণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আমলে সরকারী কাগজপত্রে লিখাইয়া দিয়াছেন। চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের রাজধানী মাধবপাশা ও হোসেনপুরের দুই মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণে আশিয়ার ও গগন নামে দুইটী গ্রাম সেলিমাবাদ পরগণার অন্তর্গত দৃষ্ট হয়। চন্দ্রদ্বীপের জমিদারী নীলাম হওয়ার পরেও রাজার এমন প্রতাপ ছিল, যাহাতে অদূরবর্ত্তী উক্ত গ্রামদ্বয় সেলিমাবাদ পরগণাভুক্ত বলিতে কেহ সাহসী হইত না। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে যখন

প্রাক্‌বস্থার জরিপ হয়, তখন এ জিলার জমিদার, তালুকদার ও মধ্যবিৎ ভূম্যধিকারিগণ নিজ নিজ স্বার্থানুসারে যে স্থান যে পরগণা লিখাইয়া দিয়াছেন, তাহাই পরিমাপক কর্ম্মচারী লিখিয়া আনিয়াছেন। বর্ত্তমান স্বরূপকাঠী, কালীগঙ্গা ও কচানদীর পূর্ব্বপাড়ে যে, সেলিমাবাদের কোন নামগন্ধ ছিল না, ইহা সুনিশ্চিত। কালক্রমে চন্দ্রদ্বীপ-রাজের অধঃপতনের পর উহা ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে প্রবেশ লাভ করিয়া প্রসারিত হইয়াছে। অতএব সীমা নির্ণয় সম্বন্ধে প্রথম অধ্যায়ে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা ধ্রুব সত্য; ইহাতে সন্দিহান হওয়ার কোন কারণ নাই। চন্দ্রদ্বীপের সামাজিক সীমানা সম্বন্ধে এই পুস্তিকার ৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

শিকারপূরে নাসিকাপীঠস্থান।

বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, ফরিদপুর ও খুলনা জিলা যে এক সময় সাগরগর্ভে নিমজ্জিত ছিল, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ যে স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই জলভাগকে প্রাচীনকালে সুগন্ধা বলা হইত * চন্দ্রদ্বীপ উৎপত্তির পূর্ব্বে উক্ত সুগন্ধায় একটী দ্বীপের সৃষ্টি হয়, তাহাই বর্ত্তমান গৌরনদী ষ্টেসনাধীন শিকারপুর গ্রাম। দক্ষালয়ে সতী দেহত্যাগ করিলে, মহাদেব উন্মত্তাবস্থায় সতীর দেহ স্কন্ধে করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিবার সময় উহা বিষ্ণুচক্রে ৫১ অংশে বিভক্ত হইয়া দেবীর নাসিকার অগ্রভাগ সুগন্ধানদীর যেস্থানে পতিতা হইয়াছিল, তথায় প্রথমতঃ একটী দ্বীপ সৃষ্টি হয়। শিকারপুরের অনতিদূরে বকাইর চর নামে একটী

---

* রেনেল্ড সাহেবকৃত ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ম্যাপে সুগন্ধা নদীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

গ্রাম আছে, কালেক্টরীর পঞ্চসনা কাগজেও উক্ত বকাইর চর গ্রামের নাম দৃষ্ট হয়। ইহাদ্বারা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, শিকারপুর পুরাকালে বৃহৎ নদীপাড়স্থিত ভূখণ্ড বা দ্বীপ ছিল, তদ্বিষয় অনুমাত্র সন্দেহ নাই। পীঠস্থান সম্বন্ধে তন্ত্র চুড়ামণি গ্রন্থে দেবী বলিয়াছেন—

স্নুগন্ধায়াং নাসিকা মে দেবস্ত্রম্বক ভৈরবঃ
সুন্দরী সা মহাদেবী সুনন্দা তত্র দেবতা॥

কালক্রমে সুগন্ধানদীর কতক স্থান স্থলরূপে পরিণত হইলে, বর্ত্তমান শিকারপুর নামক স্থানে সুনন্দা দেবীর আবির্ভাব হয়। বিক্রমপুর নিবাসী গঙ্গাগতি চক্রবর্ত্তী নামক জনৈক সাধক ব্রাহ্মণ স্বপ্নাদেশক্রমে প্রথমতঃ নদীতটে এক পাষাণময়ী মূর্ত্তি ও স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গ প্রাপ্ত হয় এবং উক্ত স্বপ্নাদেশানুসারে ঐ মূর্ত্তিদ্বয় চরভূমিতে স্থাপন করিয়া অর্চ্চনা করিতে থাকে। ঐ পাষাণময়ী মূর্ত্তিখানি উগ্রতারার মূর্ত্তি বিধায় সকলে উহাকে সুনন্দা না বলিয়া উগ্রতারা নামেই অভিহিতা করিতেছেন; উক্ত উগ্রতারার বাড়ী সাধারণতঃ শিকারপুর তারাবাড়ী নামে বিখ্যাত আছে। বর্ত্তমান পূজারিগণের পূর্ব্ববর্ত্তীর হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তক দৃষ্টে অবগত হওয়া যায়, ৬১৭ শকাব্দে সাধক গঙ্গাগতি চক্রবর্ত্তী উক্ত তারামূর্ত্তি প্রাপ্ত হন। ক্রমে সমগ্র ভারতের সাধু সন্ন্যাসিগণ উক্ত পীঠস্থানের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শিকারপুরে উপনীত হইতেন। বঙ্গাব্দ ১২৯০ সনে শিকারপুরের নিকটস্থ আটীপাড়া গ্রাম নিবাসী কতিপয় মুসলমান কর্ত্তৃক উক্ত মূর্ত্তি অপহৃত হইয়া খণ্ড খণ্ড অবস্থায় ত্রেতার আন্ধী নামক প্রাচীন দীঘিতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল এবং অচিরাৎ ঐ মুসলমান পরিবারস্থ আবাল বৃদ্ধ বনিতা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। উক্ত ত্রেতার আন্ধীর পাড়ের সেই বাড়ীখানি এক্ষণ জনশূন্য হইয়া

অদ্যাপি জঙ্গলাবৃত হইয়া রহিয়াছে। মূর্ত্তিখানি অপহৃত হওয়ার পর হইতে সাধু সন্ন্যাসী সমাগম হ্রাস পাইয়াছিল। সম্প্রতি শিকারপুর নিবাসী শ্রদ্ধেয় বৈদ্যবংশসম্ভূত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র গুপ্ত কবিরাজ মহাশয়ের আগ্রহে ও চেষ্টায় একটী ইষ্টকনির্ম্মিত মন্দির প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং তিনি ৺কাশীধাম হইতে পূর্ব্ব মূর্ত্তির অনুরূপ একখানি উগ্রতারা দেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি আনিয়া গত বৎসর (১৩১৯ সালের) ৯ই চৈত্র তারিখে উক্ত দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বরিশালের এই প্রসিদ্ধ তীর্থস্থানটীর দুর্দ্দশা মোচন করিয়া কবিরাজ মহাশয় সমগ্র ভারতবাসী হিন্দুমাত্রেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন, তদ্বিষয় কোন মতদ্বৈধ আছে বলিয়া মনে হয় না।

পোনাবালিয়ার শ্যামরাইল শিব।

বরিশাল জিলাস্থ ঝালকাঠীর ৩ মাইল দক্ষিণে পোনাবালিয়া গ্রামে শ্যামরাইল শিব বর্ত্তমান আছে। ইহাও একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। প্রতি সন শিব-চতুর্দ্দশীর দিন দেশ দেশান্তর হইতে বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এই গ্রামও এ জিলার মধ্যে অতি প্রাচীন। শিকারপুর সৃষ্টির পরেই পোনাবালিয়া ও ফুল্লশ্রী নামিক স্থানে দু'টী দ্বীপ সৃষ্টি হইয়াছিল, এ বিষয় এই পুস্তিকার প্রথমেই উল্লেখ করা গিয়াছে।

ফুল্লশ্রী বা মানসী গ্রামের মনসা দেবী।

কবিবর বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ রচনার পর ফুল্লশ্রী গ্রামের মনসা দেবীর মাহাত্ম্য বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে। এই ফুল্লশ্রীর লপ্ত পশ্চিমাংশে ঘর্ঘরা নদী প্রবাহিতা হইত, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে ফুল্লশ্রী যদিও বাঙ্গরোড়া পরগণার অধীন; কিন্তু

অতীতের অদূরবর্ত্তীকালে ফুল্লশ্রী খাস চন্দ্রদ্বীপের অধীন ছিল, ইহাতে কোন মতদ্বৈধ নাই। বাঙ্গরোড়া চন্দ্রদ্বীপের একটী খারিজা পরগণা।

কাত্যায়নী ও মদনগোপাল।

চন্দ্রদ্বীপের শেষ রাজধানী মাধবপাশার ভগ্নশ্রী রাজবাড়ীতে প্রাচীন ঝিকটি মন্দির মধ্যে অদ্যাপি চন্দ্রশেখর ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক নদীগর্ভে প্রাপ্ত কাত্যায়নী ও মদনগোপাল মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। মন্দিরের অবস্থা দেখিলে অতীত গৌরব মনে পড়ে এবং হৃদয়বান্ ব্যক্তিমাত্রেই অশ্রুমোচন না করিয়া থাকিতে পারেন না। বরিশালের খাসমহল ডিপুটী কালেক্টর শ্রদ্ধেয় মৌলবী আবহুল লতিফ সাহেব বি এ, বি এল্ মহাশয় নিজ ব্যয়ে উক্ত মন্দির দুটীর ফটোগ্রাফ উঠাইয়া ঢাকা রিভিউ পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা দেখিলে উহার প্রাচীনত্ব উপলব্ধি হইবে।

দক্ষিণচক্রঠাকুর।

চন্দ্রদ্বীপ অন্তর্গত বর্ত্তমান নলছিটী ষ্টেসনাধীন নথুল্লাবাদ গ্রামে দক্ষিণচক্র ঠাকুর নামে একটী প্রত্যক্ষের বিগ্রহ আছে। এই স্থানের বিগ্রহটী চন্দ্র-দ্বীপের রাজা রামচন্দ্রের আমল হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। প্রতি বৎসর মাঘ মাসে এই ঠাকুর বাড়ীতে একটী বড় মেলা বসিয়া থাকে।

বাজার দর।

রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের সময় এক পণ কড়িতে এক মণ ধান্য পাওয়া যাইত, আর আজ এক মণ ধান্যের মূল্য ৫৲ টাকা; সুতরাং সে কাল ও একাল সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বিষয় কত পার্থক্য হইয়াছে, তাহা বাজার দর হইতেই উপলব্ধি লইবে।

হিন্দু ও মুসলমান।

চন্দ্রদ্বীপ রাজার রাজত্বকালীন এতদ্দেশবাসিগণ অধিকাংশই হিন্দু ছিল, পরে নানা কারণে অনেক লোক মুসলমান হইয়াছে। শ্রীরামপুরের মিঞা-বংশ কোটালীপাড়ের চৌধুরীবংশ প্রভৃতি এ জিলায় বহুতর উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ নানা কারণে মুসলমান হইয়াছিলেন; কিন্তু উহারা মুসলমান হইলেও সম্পূর্ণ হিন্দুভাবাপন্ন ছিলেন, বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় তখন এত গোড়ামী ছিল না। অনেক মুসলমান অদ্যাপি দুর্গোৎসবের সময় হিন্দুদের ন্যায় নূতন কাপড় ক্রয় করিয়া ছেলে মেয়ে ও পরিবারস্থ লোকদিগকে খুসী করিয়া থাকে। কোন কোন স্থানে মুসলমানগণ লক্ষ্মীপূজাও করে। এজিলার শ্রেষ্ঠ মুসলমানগণের সমশ্রেণীর অন্যতম গৌরনদী ষ্টেসনাধীন নলচিড়ার সৈয়দবংশ দুর্গোৎসব করিয়া বৎসর বৎসর সহস্রাধিক টাকা ব্যয় করিতেন; তাহাদের প্রদত্ত বৃত্তিদ্বারা পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুগণ অদ্যাপি দুর্গাপূজা করিয়া থাকেন। বসন্তের ভয়ে অনেকে শীতলা খোলায় মানত করিত এবং পাঠা বলি দিত। পক্ষান্তরে হিন্দুগণও মুসলমানগণের দরগায় সিন্নি মানত করিত; বহুপূর্ব্বে এইরূপ ভ্রাতৃভাব ছিল এবং হিন্দু মুসলমানে পরস্পর সহানুভূতি ছিল। খোসাল, গোপাল, মদন, ফটিক প্রভৃতি নামগুলি হিন্দুভাবাপন্ন।

টাকা লগ্নি।

পূর্ব্বকালে সামান্য তালপাতায় পাত লিখিয়া টাকা কর্জ্জ করিত; দেব মন্দিরের সম্মুখে বসিয়া টাকা কর্জ্জ নিলে তাহা মহাজনের চাহিতে হইত না, খাতক আপনিই উহা পরিশোধ করিত। এক্ষণকার ন্যায় তখন এত অবিশ্বাস ও টিপ সহির ও রেজিষ্টরীর প্রয়োজন ছিল না, সকল জাতিমাত্রেই ধর্ম্ম মানিয়া চলিত; বর্ত্তমান সময়ের ন্যায় এত উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি ছিল না।

শিল্প বাণিজ্য।

রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের সময় এতদ্দেশে কার্পাস শিল্পের বিশেষ উন্নতি সাধন হইয়াছিল; উজিরপুর ও মাধবপাশার তন্তুবায়গণ অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া দেশ দেশান্তর চালান দিত। প্রত্যেক গৃহস্থের কার্পাস চাষের ভূমি ছিল এবং তাহাতে প্রচুর কার্পাস উৎপন্ন করিত এবং প্রায় প্রতেক গৃহস্থের ঘরেই চড়কা ঘুরিত; উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু বিধবাগণ চড়কায় সূতা কাটিয়া তাহা বিক্রয় করিয়া এবং ফুল কাটিয়া ও জরির কাজ করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জ্জন করিত। এক্ষণ সে দিন চলিয়া গিয়াছে এবং বঙ্গ-দেশেও দুর্ম্মূল্যে অন্নকষ্টের হাহাকার লাগিয়াছে।

নদ নদী।

চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের অন্তর্গত বহুপূর্ব্বে সুগন্ধা বা সোন্ধা নদী ছিল। বর্ত্তমান স্বরূপকাঠী নদীর পশ্চিমপাড়কে সোন্ধারকূল বলে। সুগন্ধা নদী বিভিন্ন নামে প্রখ্যাতা আছে; যথা—ইল্‌সা, তেতুলিয়া, মাসকাটা, কালাবদর, মেঘনা, আড়িয়লখাঁ, কীর্ত্তনখোলা বা বরিশাল নদী, ডাকাতিয়া, বিষখালী পাণ্ডব, কারখানা, নেহালিয়া, বিঘাই, আন্ধারমাণিক, সাপলেজা, আগুন্-মুখা, বলেশ্বর, ফাঁসিয়াতলা, চন্দনা, কুমার ইত্যাদি।

বিল।

কাজলার বিল, বাঘিয়া, কোটালীপাড়া, কুড়লিয়া, আস্কর, বড়ইয়া, ধলবাড়ীয়া, দোবরা, হারতা, ঝন্‌ঝনিয়া, ধরণদী, আদমপুর, কালারাজা, খাজুরিয়া, ডুমরিয়া ইত্যাদি।

ঝটিকাবৰ্ত্ত।

চন্দ্রদ্বীপের ৬ষ্ঠ রাজা পরমানন্দ রায়ের রাজত্বকালে বঙ্গাব্দ ৯৯০ সালে একটী ভীষণ ঝটিকাবৰ্ত্ত উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে রাজা পরমানন্দ রায় তাঁহার অমাত্যগণ সহ উচ্চ মন্দিরের চূড়ায় উঠিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন; নদীর জল বৃদ্ধি হইয়া এরূপ জল প্লাবন হয় যে, তাহাতে ঘর বাড়ী ভাসিয়া যায়। রাজপরিবারস্থ অধিকাংশ লোক নৌকারোহণ করিয়া প্রাণ রক্ষা করেন; উক্ত ঝটিকাবৰ্ত্ত ও জলপ্লাবনে প্রায় দুই লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। ১১৭৬ বঙ্গাব্দে এক ভীষণ বন্যা হয়, তাহার ফলে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল, তাহাকে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" বলে। রাজা শিবনারায়ণ রায়ের রাজত্বের প্রাক্কালে ঐ মন্বন্তর ঘটিয়াছিল।

দ্বীপ।

প্রাচীন চন্দ্রদ্বীপ পত্তন হওয়ার সমকালে চন্দ্রদ্বীপ, শিকারপুর ও বকাইর চর, কুলশ্রী প্রভৃতি দ্বীপ ছিল, তৎপর বহুতর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সৃষ্টি হইয়াছে এবং অদ্যাপি সৃষ্টি হইতেছে। চন্দ্রদ্বীপের পরে আধুনিক দ্বীপের মধ্যে দক্ষিণসাহাবাজপুর, কলমী, কাজল, বড় বাইশদিয়া, রাঙ্গাবালী, কোড়ালিয়া, ছোপা, কুকুড়ী, মুকরী, মনপুরা প্রভৃতি দ্বীপসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে।

শস্যাদি।

প্রাচীনকালে চন্দ্রদ্বীপে নানা প্রকার ধান্য ও কার্পাসের প্রচুর চাষ হইত; প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে কার্পাসের বীজ বপন জন্য ভিটা জমি থাকিত। রাজা কীর্ত্তিনারায়ণের সময় টাকায় ৮/ মণ চাউল বিক্রয় হইত, তৎস্থলে এক্ষণ টাকায় /৮ সের বিক্রয় হইতেছে। ভোট কার্পাস

ও লোট কার্পাস নামে দুই প্রকার কার্পাস উৎপন্ন হইত, তদ্দ্বারা প্রচুর পরিমাণে সূত্র বাহির করিয়া বস্ত্রাদি তৈয়ার করা হইত। তদ্ব্যতীত আম কাঁঠাল, নারিকেল, সুপারী, কলা, তেতুল, খর্জ্জুর, খেসারী, মুশুরী, সর্ষপ তিল প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত।

রয়না বা রণা বৃক্ষ।

পূর্ব্বে সর্ষপ, তিষি ও তিলদ্বারা কলুবাড়ীর ঘাইনের গাছে তৈল প্রস্তুত হইত, বর্ত্তমানকালের ন্যায় ভেজাল তৈল ছিল না। রয়না বৃক্ষের ও এরণ্ড বৃক্ষের ফল হইতে এক প্রকার তৈল প্রস্তুত হইত, তাহা বেশ ঠাণ্ডা, তাহা দ্বারা আলো জ্বালান হইত। অদ্যাপি গৌরনদী ষ্টেসনাধীন বাগধা প্রভৃতি কোন কোন গ্রামে রয়না বৃক্ষের ফলদ্বারা তৈল প্রস্তুতের নিয়ম প্রচলিত আছে। রয়না বা রণা বৃক্ষের পাকা ফল আহরণ করিয়া তদ্দ্বারা তৈল প্রস্তুত করা হইত। *

লবণ।

চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন রাজত্বকালে নারিকেল বৃক্ষের ডগা পুড়িয়া উক্ত ভস্মগুলি নেকড়ায় বান্ধিয়া তাহা উপরে রাখিয়া তদুপরি জল দিয়া টেপা ফেলিয়া লবণ প্রস্তুত করা হইত এবং সমুদ্রফেনা হইতেও কতক লবণ সংগ্রহ করা হইত; কিছুদিন পরে সিন্ধু প্রদেশ হইতে সৈন্ধব আমদানী হইতে লাগিল। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের আমলে আইনানুসারে এবম্বিধ লবণ প্রস্তুত-প্রথা রহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

---

* রয়না বা রণা বৃক্ষ সম্বন্ধে ১৩১৭ সালের পৌষ মাসের প্রবাসী পত্রিকায় অক্ষয়-কুমার রায় চৌধুরীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

কাগজ।

চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে কাগজী নামক এক জাতি ছিল, তাহারা কাগজ প্রস্তুত করিত। মুসলমানদের মধ্যে বাস্থকর সম্প্রদায় যেমন হিন্দুভাবাপন্ন, ইহারাও তদ্রূপ হিন্দুভাবাপন্ন এক জাতি ছিল। বর্ত্তমানে এ প্রদেশে ইহাদের অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে; দু'এক ঘর যাহারা ছিল, তাহারাও ব্যবসান্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের উপাধি বদলাইয়া দিয়াছে। মাধবপাশা ও পাংশা গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানের কতক স্থানকে এক্ষণও কাগজীপাড়া বলিয়া থাকে।

মালঞ্চের ও কুসুম ফুলের কারখানা।

চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের সময় মালঞ্চ ও কুসুম ফুলের বৃক্ষ রোপণ করা হইত অধিকাংশ নিম্নশ্রেণীর গৃহস্থেরা বাড়ীর চতুর্দ্দিকে কাঁচা বান্ধিয়া মালঞ্চ নামে এক প্রকার বৃক্ষ রোপণ করতঃ উহার মধ্যে মধ্যে কুসুম ফুলের গাছ লাগাইত। উক্ত কুসুম ফুল ও মালঞ্চ বৃক্ষের পুষ্প ও ছালদ্বারা রং প্রস্তুত করা হইত এবং তন্তুবায় ও জোলাগণ ঐ রং দিয়া কাপড়ের পাঁর প্রস্তুত করিত এবং সর্ব্বসুন্দর নামে এক প্রকার কাপড়ে রং ফলাইত। বিদেশ হইতে রং আমদানী আরম্ভ হওয়ার পর হইতে দেশীয় লোকের এবম্বিধ আয়ের পথ বন্ধ হইয়াছে।

নীলের কারখানা।

রাজা জয়নারায়ণের সময় চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য মধ্যে নীলের ব্যবসা ও স্থানে স্থানে নীলের কারখানা ছিল। রাজা নৃসিংহনারায়ণ রায়ের সময় তাঁহার

* নেকড়া, তুলা ও অন্যান্য জিনিষ একত্রে কাগজ প্রস্তুত করা হইত। ঐ সকল কাগজের মধ্যে লড়িকুলিয়া, পেচী মাজনা ও বড় মাজনা এই ত্রিবিধ প্রকারের কাগজই সমধিক আদৃত ছিল।

অনুমতিক্রমে নীলকুঠীর সাহেবগণ পঞ্চকরণের পূর্ব্বপাড়ে এক কুঠী বাড়ী প্রস্তুত করিয়া নীলের কারবার চালাইতেছিলেন। রাজা দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়ের বাল্যকাল পর্য্যন্ত ঐ কারবার ছিল, পরে উহা বন্ধ হইয়া গিয়াছে; কুঠী বাড়ীর ভগ্ন ইষ্টকালয় এক্ষণ জঙ্গলাবৃত থাকিয়া অতীতের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কুমলাবন ও বেতালোহা।

চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যের বহু স্থানই বিল সমাকীর্ণ ছিল; ঐ সকল বিলে কুমলাবন ও বেতালোহা জন্মিত। গ্রামিক গরীব গৃহস্থগণ বিল হইতে কুমলাবন সংগ্রহ করিয়া খড়ের ঘর নির্ম্মাণ করিত এবং বেতালোহাদ্বারা উক্ত ঘরের মচকা মারিত। অদ্যাপি গৌরনদী থানার উত্তরাংশে জল্লা, রুহির বাড়ী, কুড়লিয়া, কালাবিলা, আস্কর, বাগধা প্রভৃতি গ্রামে কুমলাবনের ঘর দেখিতে পাওয়া যায়।

তারার ও কলার ক্ষার।

প্রাচীনকালে তারাগাছ ও কলার খোল পুড়িয়া উহার ভস্মরাশি হইতে এক প্রকার ক্ষার তৈয়ারী করা হইত। উক্ত ক্ষারের দ্বারা ধোপারা কাপড় ধোলাই করিত; অদ্যাপি কোন কোন গণ্ডগ্রামে উপরোক্ত উপায়ে ক্ষার প্রস্তুতের নিয়ম প্রচলিত আছে। বর্ত্তমানে সাজিমাটী ও সাবানের আমদানী হইয়া এই প্রাচীন-প্রথা অধিকাংশ স্থানে রহিত হইয়াছে।

মুদ্রাস্বরূপে কড়ি ব্যবহার।

চন্দ্রদ্বীপ রাজাদের আমলে রাজা জয়নারায়ণ রায়ের সময় পর্য্যন্ত বর্ত্তমান সিকি, দুয়ানি, পয়সা ও আধুলির পরিবর্ত্তে কড়ি ব্যবহৃত হইত;

সাড়ে সাত কাহন কড়িতে এক টাকা গণনা করা হইত। বঙ্গাব্দ ১১৮৭ সালে যখন দুর্গাসাগর খনন করা হয়, তৎকালে কড়ি দিয়াই কুলীদিগকে বিদায় করা হইয়াছিল; সুতরাং ১২০০ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে, জনসমাজে কড়ি অবাধে প্রচলিত ছিল, তাহা নিঃসন্দেহ প্রতিপন্ন হয়। সহর কলিকাতাতে অদ্যাপি অল্লাধিক পরিমাণে কড়ির প্রচলন দৃষ্ট হইয়া থাকে॥

লোক সংখ্যা।

বর্ত্তমান সময় চন্দ্রদ্বীপ নামধেয় স্থানগুলিতে যে পরিমাণ জন সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়াছে, পূর্ব্বে তদপেক্ষা অনেক কম ছিল। যেহেতু পূর্ব্বে অধিকাংশ বিল বহুল স্থানে লোকের বসতি ছিল না; বিল উত্থিতের সঙ্গে শঙ্গে লোকের বসতি হইয়া ক্রমিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

ভাষা।

পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে সংস্কৃত চর্চ্চার বহুল প্রচলন ছিল; প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই চতুষ্পাঠী ও টোল ছিল এবং ব্রাহ্মণেতর জাতি রাজদত্ত নিষ্কর সম্পত্তির অনুবলে অভাব বোধ না করিয়া শাস্ত্র চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিত; সুতরাং ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিশাস্ত্র, স্মৃতি, ব্যাকরণ প্রভৃতির আদর বহুগুণে বর্দ্ধিত ছিল। বর্ত্তমানে সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষার অনেক উৎকর্ষ সাধন হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে ভদ্র পরিবার মধ্যেও বিকৃত বাঙ্গালা ব্যবহৃত হইত। কোটালীপাড়া প্রভৃতি বিল অঞ্চলে অদ্যাপি অধিকাংশ ভদ্রপরিবারে "আসিব" শব্দের পরিবর্ত্তে "আইস্‌ফো" শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে বরিশাল সদর বিভাগের দক্ষিণ পশ্চিমের লোকে কেন, গিয়াছিল, দিয়াছিল, নিয়াছিল এই কথাগুলির পরিবর্ত্তে কিয়া, নেছেলে, দেছেলে

প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ সকল কথাগুলি মেহেন্দীগঞ্জের লোকে গেহিলাম, নিহিলাম, দিহিলাম এই ভাবে ব্যবহার করিয়া থাকে। বর্ত্তমানে বঙ্গভাষায় উৎকর্ষের দিনে বরিশাল জিলার গৌরনদীর উত্তরাংশ ও নলছিটী, বাথরগঞ্জ থানার দক্ষিণাংশ এবং পশ্চিমাংশে নাজিরপুর থানার ও পূর্বে, মেহেন্দীগঞ্জ, ভোলা এলেকার লোকে একটা শব্দের নানারূপ বিকৃত শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে। কৃষক ও নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে হুলাক্ (আলোক), আমেজ (চিন্তা), হাস্তা, (সস্তা), কোন্ মুহী, হরবা কি ? চঙ্গ (মই), টেঙ্গা (তেঁতুল), নাও (নৌকা), সোন্দে (সন্দেহ), কাফুর (কাপড়), ঘোনা (মশারি) প্রভৃতি ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহাদ্বারা তিন শত বৎসর পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ রাজ্যে কিরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইত, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

সুন্দরবনের অবস্থা।

চন্দ্রদ্বীপ রাজত্বের প্রথম সময় সমুদ্রতীরবর্ত্তী সুন্দরবন অঞ্চলে বৃহৎ জনপদ ও লোকজনে পরিপূর্ণ ছিল। কালক্রমে আরাকানের মগ ও পর্টুগীজদিগের অত্যাচার এবং সংক্রামক রোগে উক্ত বৃহৎ বৃহৎ জনপদগুলি বহুকাল হয় জনশূন্য হইয়াছিল, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হয়। মিঃ গ্রাণ্ট নামিক জনৈক ইউরোপীয়ান তাঁহার লিখিত পুস্তকে ইহার সবিশেষ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অদ্যাপি সুন্দরবন অঞ্চলে অনুসন্ধান করিলে বড় বড় ইষ্টকনির্ম্মিত বাড়ীর ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। রেনেল সাহেবকৃত ১৭৬৪—১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের প্রস্তুতি মানচিত্রে অনেক নাড়ুফোর্টবা মাটীয়া দুর্গের চিহ্ন দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পঞ্চম অধ্যায়।

বারভুঞার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(১) প্রতাপাদিত্য - ইহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই পুস্তিকার ৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) কন্দর্পনারায়ণ রায়—ইহার পরিচয় সম্বন্ধে এই পুস্তিকার ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৩) লক্ষ্মণমাণিক্য—ইহার পরিচয় সম্বন্ধে এই পুস্তিকার ৬৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৪) চাঁদ রায় কেদার রায়—আকবর বাদসাহের রাজত্বের প্রায় দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে কর্ণাট প্রদেশ হইতে নিমু রায় নামক জনৈক ব্যক্তি বিক্রমপুরের অন্তর্গত ফুলবাড়ীয়া গ্রামে আসিয়া বাসস্থান সংস্থাপন করেন। এই নিমু রায়ের বংশে খ্যাতনামা চাঁদ রায় কেদার রায় জন্মগ্রহণ করেন। ইহারা ঘৃতকৌশিক গোত্রীয় দেববংশীয় কায়স্থ ছিলেন। * ঢাকা জিলার অধীন বিক্রমপুর পরগণার অন্তঃপাতী ফুলবাড়ীয়া ও শ্রীপুর গ্রাম কীর্ত্তিনাশা নদীর পাড়ে অবস্থিত ছিল এবং উক্ত রায় রাজগণের রাজধানী শ্রীপুরে অবস্থিত ছিল। মহারাজ প্রতাপাদিত্য যখন আকবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, তখন বারভুঞার মধ্যে চাঁদ রায় কেদার রায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহী ও অগ্রণী ছিলেন। চাঁদ রায়ের সহিত তাঁহার প্রধান অমাত্য

---

* এ বিষয়ের প্রমাণ জন্য ডাক্তার জেমস্ ওয়াইজের ১৮৭৪ সনের এসিয়াটিক সোসাইটির জর্ণাল নামক পুস্তক দ্রষ্টব্য।

শ্রীমন্ত খাঁর, কোটীশ্বর বিগ্রহের সেবাইত নিয়োগ উপলক্ষে মনোমালিন্য হয় এবং উক্ত মনান্তরের ফলে বিশ্বাসঘাতকতাক্রমে খিজিরপুরে ঈশা খাঁ মশনদ আলীকে চাঁদ রায়ের কন্যা স্বর্ণমণিকে অর্পণ করেন। শ্রীমন্ত খাঁ বালবিধবা স্বর্ণমণিকে তাহার শ্বশুরবাড়ী চন্দ্রদ্বীপ আনিবার ছলে খিজিরপুর গিয়া ঈশা খাঁকে উক্ত কন্যারত্ন প্রদান করেন। ইহাতে ঈশা খাঁর সহিত চাঁদ রায়ের যুদ্ধ হয়; তাহাতে চাঁদ রায় ঈশা খাঁর কলাগাছিয়া ও ত্রিবেণী দুর্গ বিধ্বস্ত করিয়া খিজিরপুর লুণ্ঠন করিয়া বিক্রমপুরে প্রত্যাগমন করেন। এবং কন্যাশোকে অচিরকাল মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হন। চাঁদ রায়ের লোকান্তরে কেদার রায় বিক্রমপুরের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৬০১ খৃষ্টাব্দে আকবরের সেনাপতি মানসিংহের সহিত কেদার রায়ের এক যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে মানসিংহ কেদার রায়কে কর দিতে বাধ্য করেন। সেই যুদ্ধে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ বিশেষভাবে আহত হন।

কেদার বাড়ী—কেদার রায় বিক্রমপুর ও কার্ত্তিকপুর পরগণা-দ্বয়ের মধ্যে এক প্রকাণ্ড বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, উহার চতুর্দ্দিক সুপ্রশস্ত পরিখাদ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়াছিল। ঐ পরিখা সমাচ্ছন্ন স্থান অদ্যাপি কেদারবাড়ী বলিয়া বিখ্যাত আছে। বর্ত্তমানে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত পালং থানার অধীন উক্ত কেদার বাড়ী গ্রাম অবস্থিত আছে। এখানে বরিশাল সহরের সাহা জাতীয় ধনী যুধিষ্ঠির ও ভীমচন্দ্র সাহার বাড়ী। এখানে কেদার রায়ের জাঙ্গাল নামে একটী প্রকাণ্ড জাঙ্গালও দৃষ্ট হইয়া থাকে।

রাজবাড়ীর মঠ—কীর্ত্তিনাশা নদীতটে একটী একুশরত্ন মঠ আছে, উহা কেদার রায়ের আমলের এক প্রাচীন কীর্ত্তি। কীর্ত্তিনাশা নদী চাঁদ-

রায়, কেদার রায়ের প্রায় সমস্ত কীর্ত্তিই নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে ; কিন্তু অদ্যাপি এই প্রাচীন মঠটীর অস্তিত্ব লোপ করে নাই।

প্রাচীন কালীক্ষেত্র—চাচুরতলা ঠাকুরাণ বাড়ী এবং মাঐসারের দিগম্বরী বাড়ী কেদার রায়ের আমল হইতে বিশেষ প্রত্যক্ষ দেবালয় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। প্রবাদ আছে, চাচুরতলাতে ব্রহ্মানন্দ গিরি এবং মাঐসারে কেদার রায়ের ইষ্টদেব গোসাঞি ভট্টাচার্য্য সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

(৫) ঈশা খাঁ মশনদ আলী—ঢাকা জিলার অন্তঃপাতী নারায়ণগঞ্জের এক মাইল উত্তর পূর্ব্বদিকে ঈশা খাঁর রাজধানী খিজিরপুর অবস্থিত আছে। এই স্থানে বারভুঞার অন্যতম ভুঞা ঈশা খাঁ রাজধানী স্থাপন ও এক দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। বর্ত্তমান সময় খিজিরপুরে অন্তর্গত কতক স্থান গবর্ণমেণ্টের খাসমহল অন্তর্গত। উহার তৌজীর নম্বর ৯৮৭১। ঈশা খাঁর পিতা হিন্দু ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল কালিদাস। ইঁনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুলেমান খাঁ নামে পরিচিত হন। বর্ত্তমান ময়মনসিংহের অন্তর্গত জঙ্গলবাড়ীর নিকট কোচজাতীয় লক্ষ্মণ হাজোয়া নামক এক ব্যক্তি শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। ঈশা খাঁ ঐ স্থান আক্রমণ করিয়া লক্ষ্মণ হাজোয়াকে পরাজিত করেন এবং তথায় একটী বাড়ী নির্ম্মাণ করেন ; এক্ষণ তাঁহার সন্ততিগণ উক্ত জঙ্গলবাড়ীতেই বাস করিতেছেন। ঈশা খাঁর দুই পুত্র ; প্রথম দেওয়ান মুশা খাঁ, দ্বিতীয় দেওয়ান মহম্মদ খাঁ। খিজিরপুরের নিকট ঈশা খাঁর প্রপৌত্রের নাম মনোর খাঁর নামানুসারে যে "মনোরবাগ" গ্রাম আছে, তথায় ১৯০৯ সালে একজন কৃষক হল চালনকালে ঐ স্থলের ভূগর্ভ হইতে সাতটী কামান প্রাপ্ত হয়। উহার প্রথমটীতে ঈশা খাঁর নাম খোদা

আছে। উহার একটীর নম্বর ১০০২। ১৫৯৮ খৃষ্টাব্দে ঈশা খাঁ পরলোক গমন করেন।

(৬) ফাজেল গাজী ও চাঁদ গাজী—বর্ত্তমান ঢাকা জিলার অন্তর্গত ভাওয়াল ও রণ ভাওয়াল স্থানে যে তিনটী প্রাচীন রাজবাড়ী দৃষ্ট হয়, তথায় শিশুপাল নামে এক হিন্দু রাজা বাস করিত। দীল্লি হইতে ফাজেল গাজী নামিক একজন সৈনিক আসিয়া কেদার রায়ের কিছু করিতে না পারিয়া ভাওয়ালের শিশুপাল রাজাকে বধ করিয়া তাঁহার রাজধানী অধিকার করেন। এই গাজীবংশের চাঁদ গাজীর নামানুসারে পরগণার নাম চাঁদপ্রতাপ হইয়াছে। চাঁদ গাজীর সেনাপতি সঞ্জয় হাজরার বংশধরেরাই বর্ত্তমানে ঐ পরগণার জমিদার বলিয়া পরিচিত আছেন।

(৭) মুকুন্দরাম রায়—বর্ত্তমান ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মধুমতী নদীর পূর্ব্বতীরে ভূষণা নামক স্থানে মুকুন্দরাম রায় বাস করিতেন; তিনি প্রথমতঃ ভূষণার এক সামান্য জমিদার বলিয়া পরিচিত ছিলেন; পরে স্বীয় প্রতিভাবলে ভুঞাশ্রেণীতে উন্নীত হইয়া, দ্বাদশ ভৌমিকের একজন বলিয়া প্রতিপত্তি লাভ করেন। তৎকালীন পূর্ব্ব ও পশ্চিমবঙ্গে যে সকল পরাক্রান্ত জমিদারগণ বাদসাহের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ভুঞা পদবাচ্য হন। তন্মধ্যে যশোহরের প্রতাপাদিত্য অকুতোভয়ে বাদসাহ আকবর ও জাহাঙ্গীরের বহু সেনাপতি সহ যুদ্ধ করিয়াছিলেন; সুতরাং বারজন ভুঞার মধ্যে তাঁহার নামই "বঙ্গের শেষ বীর" বলিয়া ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

ভূষণাকে পূর্ব্বে ভূষণা-মামুদপুর বলিত; কিন্তু গড়ুই নদীর গতি পরি-

বর্ত্তমানে মধুমতীর উদ্ভব হইয়া ভূষণা ও মামুদপুরকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। প্রাচীনকালের সমৃদ্ধিসম্পন্না ভূষণা এক্ষণ কেবলমাত্র একটি পুলিশ ষ্টেসন বক্ষে ধারণ করিয়া পূর্ব্ব গৌরবের ক্ষীণস্মৃতি জন সাধারণের গোচরীভূত করিতেছে।

আবুল ফজলকৃত আকবরনামাগ্রন্থে মুকুন্দ রায়কে· মুকুন্দ জমিদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে এবং হিজিরী ৯৮৮ সালে বঙ্গের শসেনকর্ত্তা দাউদের অধীনে থাকিয়া মোরাদ খাঁ ফতেয়াবাদ নামক বিস্তীর্ণ জনপদ শাসন করিতেন। পাঠান কতলু খাঁ. মোগল মোরদ খাঁর শাসনাধীন ফতেয়াবাদ আক্রমণ করিলে, মুকুন্দ রায় তাঁহার সৈন্যগণ সহ কতলু খাঁর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন, তাহাতে উক্ত পাঠান কতলু খাঁ পরাস্ত হইয়া পলায়ন করে। রাজা তোড়লমল মুকুন্দ রায়কে মোগল পক্ষাবলম্বী জানিয়া রাজা উপাধি দিয়া ফতেয়াবাদের শাসন-ভার অর্পণ করেন। ফতেয়াবাদ কায়স্থ সমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মুকুন্দরাম রায় বহুতর নিষ্কর সম্পত্তি দান করিয়া গিয়াছেন। বঙ্গাব্দ ৯৯০ সালে· দীঘলবালা গ্রাম নিবাসী প্রাণনাথ ভট্টাচার্য্য মুকুন্দ রায় প্রদত্ত যে নিষ্কর সম্পত্তির সনন্দ প্রাপ্ত হন, উক্ত নিষ্কর ১২০৯ সালের তায়দাদে যশোহর কালেক্টরীতে দাখিল আছে।

মুকুন্দরাম রায়ের ৬টি পুত্র; তন্মধ্যে শত্রুজিৎ রায় ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের গবর্ণর সুলতান সুজা কর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া ঢাকায় প্রেরিত হন এবং তথায় তাঁহার মৃত্যু ঘটে। উক্ত শত্রুজিৎ রায়ের প্রদত্ত একখানি দেবত্র সনন্দ গঙ্গারামপুরের পরেশনাথ স্মৃতিতীর্থের ১৯৩৩নং তায়দাদে যশোহরের কালেক্টরীতে দৃষ্ট হয়। শত্রুজিৎ রায় ভূষণা পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান যশোহর জিলার অধীন শত্রুজিৎপুরে নিজ বাসস্থান নির্দ্দেশ

করিয়াছিলেন। মুকুন্দ রায়ের শাসনাধীন ফতেয়াবাদ বর্ত্তমানে যশোহর, খুলনা, ফরিদপুর জিলায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।

(৮) বিষ্ণুপুরের হাম্বিরমল্ল—বর্ত্তমান বাঁকুড়া জিলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর একটী প্রসিদ্ধ স্থান। প্রাচীনকালে ইহাকে বন বিষ্ণুপুরও বলিত। এই স্থানে হাম্বিরমল্ল বা হামীর নামে এক নরপতি রাজত্ব করিতেন; তিনিও দ্বাদশ ভুঞা মধ্যে একজন ভুঞা ছিলেন। ইনি প্রকাশ্যে তৎকালীন মোগল বাদসাহের প্রতিকূলাচারণ করেন নাই; কিন্তু পরোক্ষভাবে বঙ্গের অপর ভুঞাগণের সহিত তাঁহার যোগ ছিল।

(৯) সাতৈলের রাজা রামকৃষ্ণ—বর্ত্তমান পাবনা জিলার অন্তর্গত চাটমহল থানার অধীন সাতৈল নামক প্রদেশে রাজা রামকৃষ্ণ রাজত্ব করিতেন। রামকৃষ্ণের স্ত্রীর নাম রাণী সর্ব্বাণী। ইহারা স্বামী স্ত্রী উভয়েই অত্যন্ত ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। কালক্রমে নাটোরের রাজা রঘুনন্দন, রাজা রামকৃষ্ণের সমস্ত সম্পত্তি হস্তগত করেন এবং বর্ত্তমানেও ইহা নাটোর রাজষ্টেটের অন্তর্গত হইয়া রহিয়াছে।

(১০) তাহিরপুরের কংশনারায়ণ—বর্ত্তমান রাজসাহী জিলার অন্তঃপাতী তাহিরপুরে কংশনারায়ণ নামে এক ভুঞা রাজত্ব করিতেন। ইনি জাতিতে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন; ইনি বারেন্দ্রদের নিরাবিল পটীর নিয়ম বন্ধন করেন এই বংশের শেষ রাজার নাম ছিল শিবপ্রসাদ।

(১১) পুঠিয়ার রাজা—রাজসাহী জিলার অন্তর্গত পুটিয়ার রাজবংশ প্রাচীন বারভুঞার অন্তর্গত জনৈক ভুঞা ছিলেন বলিয়া জানা যায়। পুটিয়ার রাজবংশ অদ্যাপি তাঁহাদের প্রাচীন জমিদারী রক্ষা করিয়া আসিতেছেন।

(১২) দিনাজপুরের রাজা—বর্ত্তমান দিনাজপুর জিলার রাজা প্রাচীন বার ভুঞার অন্তর্গত জনৈক ভুঞা ছিলেন বলিয়া কোন কোন গ্রন্থকার উল্লেখ করেন। কেহ কেহ বলেন দিনাজপুরের রাজা গণেশ ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে পশ্চিম বঙ্গে স্বতন্ত্র স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন। বার ভুঞাগণ যে প্রকার বড় বড় জমিদার ছিলেন, তদপেক্ষা দিনাজপুরের রাজার সৈন্য সামন্ত এবং রাজ্যের সীমানা বহুগুণে বর্দ্ধিত ছিল। যাহা হক্ রাজা গণেশ ও তদ্বংশধরগণ উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন এবং এই বংশে সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

মধুসিংহ ভূমি (ভুঞা)।

বর্ত্তমান বর্দ্ধমান জিলার কিছু উত্তরে কোকড়ার প্রসিদ্ধ জমিদার মধু-সিংহ ভূমি বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ও পরাক্রান্ত ছিলেন. কেহ কেহ তাঁহাকেও বার ভুঞার মধ্যে ফেলিতে চাহেন ; তাহা হইলে ভুঞার সংখ্যা দ্বাদশের পরিবর্ত্তে ত্রয়োদশ হইয়া পড়ে।

ব্যক্তিগত আলোচনা।

প্রাচীনকালের উপরোল্লিখিত বার ভুঞার মধ্যে প্রায় সকলেই শিক্ষিত এবং বিদ্বান্ ছিলেন ; তন্মধ্যে যাঁহার সম্বন্ধে যতটুক্ জানা গিয়াছে, তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করা গেল।

(১) প্রতাপাদিত্য।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য সংস্কৃত, পারস্য, হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি যখন সম্রাট্ আকবরের দরবার জন্য দিল্লীতে অবস্থান

করিতেছিলেন, তখন সম্রাট্ আকবর একদিন সভাস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীকে একটী সমস্যা পূরণ করিতে আদেশ করেন। সমাগত সভ্যগণ সকলেই এক একটী কবিতা রচনা করিয়া উক্ত সমস্যা পূরণ করেন; সম্রাটের কিন্তু উহার কোনটীই মনোমত না হওয়ায় তিনি পুনর্ব্বার উহা পূরণ করিতে আদেশ করেন। তখন প্রতাপাদিত্য স্বীয় প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পাইয়া সম্রাট্ সন্নিধানে গমন করতঃ যথাবিহিত অভিবাদনপূর্ব্বক কহিলেন "জাহাঁপনার আজ্ঞা হইলে এই সেবক সমস্যা পূরণ করিতে পারে।" সম্রাট্ সমস্যা পূরণের জন্য আদেশ প্রদান করিলে, প্রতাপ নিম্নলিখিত পাদপূরণ করিলেন—

সম্রাটের সমস্যা—"সেত ভূজঙ্গিনী যাত চলিহেঁ।"

প্রতাপাদিত্যের পূরণ—

শোবর কামিনী নীর নীহারতিরিত ভালিহেঁ।
চিরম চরকে গঠপর বাপিকে ধারেচ্ছু চঙ্গ চলিহেঁ॥
রায় বেচারী আপন মনমে উপনাও চারিহেঁ।
কেছঙ্গ মরোরতি সেত ভুজঙ্গিনী যাত চলিহেঁ॥

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের এই পাদপূরণ সম্রাটের মনোমত হওয়ায় তিনি প্রতাপকে বহুমূল্য দ্রব্য পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করেন এবং এই সূত্রপাতে বাদসাহের সুনজরে পড়িয়া অচিরকাল মধ্যে নিজ নামে যশোহর রাজ্যের সনন্দ গ্রহণপূর্ব্বক যশোহরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

(২) কেদার রায়।

বঙ্গদেশীয় বার ভুঞাগণ বাদসাহ আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হওয়ার ষড়যন্ত্র করিলে বাদসাহ আকবর রাজা মানসিংহকে বার ভুঞা দমন জন্য

প্রভৃত সৈন্য সামন্ত দিয়া বাঙ্গালায় প্রেরণ করেন। তদনুসারে সেনাপতি মানসিংহ শ্রীপুরের নিকটবর্ত্তী হইয়া কেদার রায় নিকট এক দূত প্রেরণ করেন। ঐ দূতের নিকট শৃঙ্খল ও তরবারী দিয়া বলিয়া দেওয়া হয় যে, যদি কেদার রায় শৃঙ্খল গ্রহণ করিয়া বাদসাহের আনুগত্য স্বীকার করেন, তাহা হইলে তদ্বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করা হইবে না; নচেৎ তরবারী গ্রহণ ও শত্রুভাব প্রকাশ করিলে তাঁহাকে অবশ্য দমন করিতে হইবে। ঐ দূতের নিকট রাজা মানসিংহ নিম্নলিখিত শ্লোকযুক্তে একখানি চিঠি প্রেরণ করেন তাহা এই—

ত্রিপুর মঘ বাঙ্গালী কাককুলী চাকালী
সকল পুরুষমেতৎ ভাগ যাও পালায়ী।
হয়-গজ-নর-নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষম সমরসিংহো মানসিংহঃ প্রয়াতি॥

উক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া কেদার রায় শ্লোকের উত্তরসূচক আর একটী শ্লোক লিখিয়া দূতের হস্তে দিয়া বলিলেন, যাও দূত এই শ্লোকটী তোমার প্রভুকে দিয়া বলিও যে, আমি তরবারী গ্রহণ করিলাম। শ্লোকটী এই—

ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতি রেকম্।
করোতি বাসং গিরিরাজ শৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥

(৩) ভুলুয়ার লক্ষ্মণমাণিক্য।

এই পুস্তিকার ৬৯ পৃষ্ঠায় লক্ষ্মণমাণিক্যের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইনি যেমন বীরপুরুষ ছিলেন, তেমন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত

ভাষায় ইঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। ইনি বিখ্যাত বিজয় নামে একখানি সংস্কৃত নাট্যগ্রন্থ রচনা করেন। ঐ নাটকের সূত্রধর প্রস্তাবটী নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। সংস্কৃতভাষাবিৎ ব্যক্তিগণ ইহাদ্বারা লক্ষ্মণের পাণ্ডিত্য অনুভব করিতে পারিবেন। অর্জ্জুনকর্ত্তৃক কর্ণবধ অবলম্বনে ইহা লিখিত হইয়াছিল। যথা,—

'প্রেক্ষাবৎ পরিতোষ নিস্তল মহামাণিক্য রত্নাকরঃ।
প্রাক্ সৎপুরুষ পৌরুষোৎকর কথা স্রোতস্বতী ভূধরঃ॥
দৃপ্যচ্চারণ চাতুরী মধুকরী প্রাগল্‌ভ্য পুষ্পাকরঃ।
শ্রীলক্ষ্মণ ভূপতের ভিনবস্তাদৃক্ প্রবন্ধোত্তরঃ॥
আশ্রয়ো যস্য রাজা নস্তস্য বীর রসস্য চেৎ।
প্রবন্ধো ভূ ভুজাবদ্ধস্তস্মিন্নৌ পরিকশ্রমঃ॥

বারভূঞাগণ জমিদার হইলেও তাঁহাদের রাজপ্রসাদ, সৈনিকাবাস, বিচারালয়, কারাগার, কোষাগার এবং অন্যান্য সমস্তই রাজোচিত বন্দোবস্ত ছিল। তাঁহাদের সময় দুর্ভিক্ষ, মহামারী অতি অল্পই সংঘটিত হইত। ইহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ ও দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্ ছিলেন। ইহাদের সময় টাকায় ⁄৮ সের চাউল ছিল না এবং অবাধ বাণিজ্যের ফলে বঙ্গদেশ অন্নাভাবে হাহাকার করিত না। ইহাদের সময় বস্ত্রের জন্য বিদেশী কলওয়ালার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইত না। ইহাদের সময় কলের ভেজাল কটু তৈল ছিল না, ইহাদের সময় চর্ব্বি মিশ্রিত ঘি ছিল না, ইহাদের সময় যুবকগণ 'সর্ট ছাইট' বলিয়া চস্‌মা পরিতেন না এবং ২০বৎসর বয়স্ক যুবকের চুল পাকিত না, ইহাদের সময় ব্রহ্মচর্য্যবিহীন ভগবদুপাসনাশূন্য ব্রাহ্মণ ছিল না, ইহাদের সময় বিচারালয়ে প্রত্যহ হাজার হাজার মিথ্যা এভিডেবিট পাস

করিতে হইত না এবং টাকা কর্জ্জ নিয়া কেহ মিথ্যা জবাব দিত না। পুনরপি কবে সেই ধর্ম্মে মতি ফিরিয়া আসিবে, আবার কবে সেই সংস্কৃত সামগানে বঙ্গদেশ মুখরিত হইবে, সর্ব্বনিয়ন্তা যিনি, তিনিই ইহা বলিতে পারেন, জনৈক ক্ষুদ্র বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা বলা সম্ভবপর নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপের খারিজা পরগণার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

(১) গিরিধি বন্দর (বরিশাল টাউন), (২) বোজরোগ উমেদপুর, (৩) হাবেলী সেলিমাবাদ, (৪) হাবেলী, (৫) ইদিলপুর, (৬) নাজিরপুর, (৭) রত্নদী কালিকাপুর, (৮) কৃষ্ণদেবপুর, (৯) রামহরিরচর, (১০) কলমি চর, (১১) সুলতানাবাদ; (১২) জাফরাবাদ রফিয়ানগর, (১৩) খাঞ্জাবাহাদুর নগর, (১৪) আবদুল্লাপুর, (১৫) আজিমপুর, (১৬) ইদ্রাকপুর, (১৭) রসুলপুর, (১৮) বাঙ্গরোড়া, (১৯) কোটালীপাড়া (২০) জালালপুর, (২১) হবিবপুর, (২২) সায়েস্তাবাদ, (২৩) সায়েস্তানগর, (২৪) কাদিরাবাদ, (২৫) কাশীমপুর শেলাপট্টি, (২৬) মাদারীপুর, (২৭) রামনগর, (২৮) সফি-পুরকালা, (২৯) আমিরাবাদ, (৩০) বীরমোহন, (৩১) গোপালপুর, (৩২) দুর্গাপুর, (৩৩) সাহাজাদপুর, (৩৪) বৈকুণ্ঠপুর, (৩৫) আওরঙ্গপুর, (৩৬) গোপীনাথপুর, (৩৭) সৈদপুর, (৩৮) নাজিরপুর।

উক্ত পরগণা সমূহের মধ্যে কোটালীপাড়া, মাদারীপুর, গোপীনাথপুর এই তিনটী পরগণা সম্পূর্ণ ফরিদপুর কালেক্টরীর তৌজীভুক্ত হইয়াছে এবং

বৈকুণ্ঠপুর, আমিরাবাদ, সফিপুরকালা, কাশীমপুর, সেলাপট্টি, রামনগর, কাদিরাবাদ, জালালপুর, ইস্রাকপুর, রসুলপুর, ইদিলপুর, হবিবপুর বরিশাল ও ফরিদপুর উভয় জিলার কালেক্টরীতে ঐ সকল পরগণার রাজস্ব দাখিল হইয়া থাকে এবং ঐ সকল পরগণার জমিগুলি উভয় জিলায় পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে;

হাবেলী সেলিমাবাদের রাজস্ব বরিশাল ও খুলনা জিলার কালেক্টরীতে দাখিল হইয়া থাকে এবং উক্ত পরগণার জমিসমূহ বরিশাল ও খুলনা জিলা-ভুক্ত হইয়া রহিয়াছে।

উক্ত পরগণাগুলির অধিকাংশ নামই মুসলমান নামের আদ্যক্ষর বা সম্পূর্ণ যথা—সায়েস্তানগর, সায়েস্তাবাদ, আলীমগর, রসুলপুর, সফীপুর, বোজরোগ উমেদপুর, আবদুল্লাপুর ইত্যাদি এবং এই সকল নাম তৎকালীন স্থানীয় গবর্ণর বা স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোকের নামে সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, তদ্বিষয় সন্দেহ নাই। চন্দ্রদ্বীপ রাজার যখন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ছিল, তখন জনসংখ্যা ও লোকের বসতি খুব কম ছিল এবং উপরোক্ত পরগণার অধি কাংশের অন্তর্গত জমিগুলি বিলঝিলে পরিণত ছিল এবং উহা অল্পসংখ্যক লোকেরই বাসোপযোগী হইয়াছিল। তৎপর রাজার অবস্থা ক্রমশঃ শোচনীয় হইতে আরম্ভ হওয়ায় উক্ত পরগণার সৃষ্টিকারী কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুকদারভাবে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল। মহানুভব লর্ড কর্ণওয়ালিশ যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন, তাহার কিছু পূর্ব্বে হইতে যখন জমিদারী বন্দোবস্ত আরম্ভ হয়, তখন ঐ সকল পরগণার স্থান নিয়া তত্তৎ স্থানীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিগণ লর্ড কর্ণওয়ালিশের সহিত বন্দোবস্ত করেন। তখন চন্দ্রদ্বীপের নাবালক রাজা জয়নারায়ণের বিশ্বাসঘাতক

কর্ম্মচারিগণ আপন আপন উদর পূরণের চেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। নাবালক রাজার দিকে তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া জমিদারী রক্ষা করিবার কোন উপযুক্ত লোক ছিল না; সুতরাং চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য হইতে খারিজ হইয়া উল্লিখিত বহু পরগণা স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময় যাহারা এই বৃত্তান্ত পাঠ করিবেন, তাহারা হয়ত মনে করিবেন যে, ইহা লেখকের কল্পনা এবং একদেশদর্শিতামূলক উক্তি, বস্তুতঃ তাহা নহে। পরগণা সৃজন সময় যে সকল বন্দোবস্ত রোবকারী লিখিত হইয়াছে, তাহা বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা ও খুলনার কালেক্টরীতে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে; তাহা দৃষ্টি করিলে ইহার সত্যতা উপলব্ধি হইবে। উহার প্রত্যেক নূতন পরগণার সঙ্গেই গয়রহ শব্দ সংযোগ করার আদেশ আছে। এস্থলে বলা বাহুল্য যে, কোটালীপাড়া, ইদিলপুর ও বোজরোগ উমেদপুর পরগণাত্রয় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বহুপূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ হইতে খারিজ হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল। ঐ সকল পরগণাগুলি ছোট বড় উভয় প্রকার ছিল; কারণ পরগণা সৃষ্টি সময় উহার তৎকালীন ভূম্যধিকারী যে প্রকার প্রবল ও ক্ষুদ্র ছিলেন, পরগণাও তদ্রূপ বৃহৎ ও ক্ষুদ্র হইয়াছিল; অমরাপুর নামে একটী পরগণা সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমানে খাসমহলভুক্ত আছে, উহা এত ক্ষুদ্র যে উহার সরকারী রাজস্ব বার্ষিক ৭৶৹ আনা মাত্র।

খারিজা তালুক।

মহানুভব লর্ড কর্ণওয়ালিসকর্ত্তৃক জমিদারী বন্দোবস্ত হইলে, পরে জমিদারীর নিম্নস্থ হকিয়তদারগণ জমিদারের অধীনতা-পাস হইতে মুক্তি-প্রয়াশে বৃটিশ গবর্ণমেন্টের সহিত হকিয়তগুলি বন্দোবস্ত করিয়া খাস গবর্ণ-মেন্টের অধীনে থাক্‌বার প্রার্থনা করিলেন, সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেন্ট তাহাদের

প্রার্থনাও উপেক্ষা করিলেন না। উক্ত মধ্যস্বত্বাধিকারিগণের রাজস্ব তদুপরিস্থ জমিদারী হইতে বাদ দিয়া তালুক, ওসত তালুক, নিম ওসত তালুক, এমন কি হাওলা স্বত্বের মালিকান সহিতও বন্দোবস্ত করিলেন। বরিশাল কালেক্টরীতে ২০৪৬নং তৌজীতে হাওলা তিহাই নামে একটী মধ্য স্বত্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল, উহা উদাহরণ স্বরূপ এখানে প্রদত্ত হইল।* এই প্রকারে প্রত্যেক পরগণা হইতেই বহুসংখ্যক মধ্যস্বত্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল, ইহাকেই বর্ত্তমানে খারিজা তালুক ও খারিজা হাওলা বলে। বরিশাল কালেক্টরীর অধীন যত পরগণা আছে, তন্মধ্যে বাঙ্গরোড়া পরগণায় যত মধ্যস্বত্ব বন্দোবস্ত হইয়াছিল, এতগুলি আর কোন পরগণায় দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গরোড়া পরগণাটী সম্পূর্ণ বর্ত্তমান গৌরনদী থানার অন্তর্গত এই পরগণায় ৯৩৯ খানি খারিজা তালুকের সৃষ্টি হইয়াছিল। গৈলা গ্রামের লপ্ত মানসী গ্রামে একখানি খারিজা তালুক আছে, তাহার সরকারী রাজস্ব ⁄৪ পাই মাত্র ; এই তালুকের অন্তর্গত জমি সবে মাত্র অৰ্দ্ধ কাণি পরিমিত একখানি তালভিটা, ইহাতে বহুকালের কয়েকটী তালবৃক্ষ বিদ্যমান আছে। বাঙ্গরোড়া পরগণায় জমিদারীর বার্ষিক সদর রাজস্ব ৩৬৫।৶৯॥ পাই এবং ৯৩৯ খানি খারিজা তালুকের বার্ষিক সদর রাজস্ব ২০১২৪৶৯ পাই। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় সম্ভবতঃ এ জিলার অন্যান্য স্থান অপেক্ষা গৌরনদী থানার লোক সমূহ সমধিক শিক্ষিত ছিল, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তালুক বন্দোবস্তদ্বারাই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গরোড়া পরগণার পরে বোজরোগ উমেদপুর পরগণার অধীন ৪০৭ খানি, উত্তর সাহাবাজপুর পরগণার অধীন ২৯৪ খানি ইদিলপুরের অধীন ১১৯ খানি এবং সায়েস্তানগরের অধীন ১৬১ খানি খারিজা তালুক দৃষ্ট হইয়া থাকে।

৭ম অধ্যায়।

বর্ত্তমান চন্দ্রদ্বীপ পরগণার মালিকগণের পরিচয়।

আধুনিক চন্দ্রদ্বীপ পরগণা বাখরগঞ্জ কালেক্টরীর তিনটী তৌজীর অধীন ; যথা—১৭২০নং হিস্বে ॥১২॥/ ক্রান্তি, ১৭২১—১৭২২নং হিস্বে ।/১০আনি এবং ১৭২৩নং হিস্বে /১৭।/ ক্রান্তি। এই তিনটী তৌজীর মধ্যে ১৭২০নং তৌজীর মালিক মাধবপাশা নিবাসী সাহাজাতীয় বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরী গং, ১৭২১—১৭২২নং তৌজীর মালিক কলিকাতা পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর নাইট সি, আই, হি এবং ফরিদপুর জিলার অধীন বাইশরশির জমিদার শ্রীযুক্তা কামিনীসুন্দরী চৌধুরাণী ও শ্রীযুক্তা শিবসুন্দরী চৌধুরাণী এবং ১৭২৩নং তৌজীর মালিক বরিশাল টাউনের জমিদার বাবু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্ম্মণ ; উক্ত তৌজীত্রয়ের মালিকানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১৭২০নং তৌজী।

এই তৌজীর ষোল আনি রকমের হিস্বে ॥১২॥/ ক্রান্তির অংশে নিম্ন-লিখিত মালিকগণ বর্ত্তমান আছেন।

(১) বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরী জমিদার মাধবপাশা হিং ।১৫ গণ্ডা।

(২) বাবু হীরালাল রায় চৌধুরী ঐ ঐ ঐ ।১৫ গণ্ডা॥

(৩) সারদাসুন্দরী চৌধুরাণী স্বামী মৃত গুরুদাস সাহা চৌধুরী স্থলে বর্ত্তমান দাখিলকার শচীনাথ সাহা হাল সাকিন বরিশাল পূর্ব্ব মালিক কালী-কুমার রায় চৌধুরী হইতে প্রাপ্ত .... ৭॥ গণ্ডা।

(৪) বাবু বিরাজমোহন রায় চৌধুরী এবং তাঁহার অপর ভ্রাতৃদ্বয় হাল সাকিন বরিশাল, ৺ শ্রীনাথ রায় চৌধুরী হইতে প্রাপ্ত ... /৫ গণ্ডা।

(৫) শ্যামলাল রায় চৌধুরী জমিদার মাধবপাশা ... /০ আনি।

(৬) বাবু রাধারমণ রায় চৌধুরী এবং তাঁহার মাতা ভাগ্যবতী চৌধুরাণী জমিদার মাধবপাশা ... ... ৴১০ গণ্ডা।

(৭) নিস্তারিণী চৌধুরাণী জমিদার মাধবপাশা ... ৴১০ গণ্ডা।

(৮) মৌলবী এ, কে, ফজলাল হক্ এম্ এ, বি এল্, এবং মৌলবী মহম্মদ এছমাইল খাঁ চৌধুরী চড়ামদ্দী ... ... ৴৭॥ গণ্ডা।

১৲

মাধবপাশার সাহা জমিদার।

াধবপাশা নিবাসী বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরী এবং হীরালাল রায় চৌধুরী ও বাবু শ্যামলাল রায় চৌধুরীর পূর্ব্বাধিকারী পরলোকগত রামমাণিক্য সাহা চৌধুরী ১২০৬ সালে ঢাকার কালেক্টরীর নীলামে আধুনিক চন্দ্রদ্বীপ পরগণার ॥১২॥৴৴ ক্রান্তি অংশ খরিদ করেন। উক্ত রামমাণিক্য সাহা হইতে তাঁহার অধস্তন বংশধরগণের নিম্নলিখিত বংশপত্রিকা দেওয়া গেল। রামমাণিক্যের অপর ভ্রাতা ত্রয়ের নাম ;—(২) রঘুনাথ, (৩) রাধাকৃষ্ণ, (৪) শ্যামরাম। রামমাণিক্যের দুই পুত্র—(১) রামকানাই, (২) বলরাম। রামকানাইর পুত্র গুরুদাস ও দীনবন্ধু। গুরুদাসের পুত্র কালীকুমার এবং দীনবন্ধুর পুত্র রাজকুমার ; রাজকুমারের পুত্র বিহারীলাল রায় চৌধুরী। বলরামের দুই পুত্র গোপাল ও গোবিন্দ। গোপালের পুত্র দ্বারকানাথ,

রাধামাধব ও ব্রজনাথ। * গোবিন্দের পুত্র প্যারীমোহন; প্যারীমোহনের পুত্র শ্যামলাল রায় চৌধুরী। রামমাণিক্যের ভ্রাতা রঘুনাথের চারি পুত্র—রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন। তন্মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন নিঃসন্তান। ভরতের পুত্র রাজবল্লভ; তৎপুত্র মধুসূদন, তৎপুত্র হীরালাল রায় চৌধুরী। রামমাণিক্যের অপর ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণের পুত্র গৌরকিশোর, তৎপুত্র শ্রীনাথ, তৎপুত্র গোলোকনাথ রায় চৌধুরী। সর্ব্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্যামরামের পুত্র মথুরানাথ, তৎপুত্র বর্ত্তমান বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরী। উক্ত রাজকুমার রায় চৌধুরীর অংশ নীলাম হইলে, হাইকোর্টের উকীল মৌলবী এ, কে, ফজলাল হক্ এম্ এ, বি এল্ এবং চড়ামদ্দীর জমিদার মৌলবী মহম্মদ ইস্মাইল খাঁ চৌধুরী খরিদ করেন। শ্রীযুক্তা নিস্তারিণী চৌধুরাণী পরলোকগত রাজবল্লভ রায় চৌধুরীর কন্যা ইনি গোলোকনাথ রায়ের অংশ হইতে জমিদারীর ৴১০ অর্দ্ধ আনা অংশ খরিদ করিয়াছেন। সারদাসুন্দরী চৌধুরাণী পরলোকগত কালীকুমার রায় চৌধুরীর অংশ খরিদ করিয়াছেন। বাবু বিরাজমোহন রায় চৌধুরী এবং তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয় বাবু নলিনীমোহন রায় চৌধুরী ও বাবু রমণীমোহন রায় চৌধুরী—ফরিদপুর জিলার অধীন ওলপুর নিবাসী বরিশালের ভূতপূর্ব্ব স্বনাম প্রসিদ্ধ উকীল পরলোকগত ৺ নবীনচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র, তাঁহারা গোলোকনাথ বাবুর অংশ হইতে চন্দ্রদ্বীপের ৵৫ গণ্ডা অংশ খরিদ করেন। বিরাজ বাবু বরিশাল মিউনিসিপালিটীর

---

* উক্ত দ্বারকানাথ ৶৶৷/ ক্রান্তি, ব্রজনাথ ৶৶৷/ ক্রান্তি এবং রাধামোধব ৶৷৷/ একুনে কুড়ি গণ্ডার ৴১০ গণ্ডা রাধারমণ বাবুর মাতা ভাগ্যবতী চৌধুরাণী খরিদ করেন; অবশিষ্ট ৴১০ গণ্ডা বরিশাল টাউনের প্রসিদ্ধ ধনী ৺ গোবিন্দমোহন রায় চৌধুরী খরিদ করিয়াছেন।

সেক্রেটরী এবং বরিশাল টাউনের সকল শ্রেণীর লোকের শ্রদ্ধার পাত্র; ইঁনি নিস্বার্থভাবে বরিশাল টাউনের কল্যাণ কামনায় অনধিক ১৫ বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রমে মিউনিসিপাল সেক্রেটরীর কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

মাধবপাশা রাজবাড়ীর উত্তরদিকে রামমাণিক্য সাহা চৌধুরীর বাড়ী। এই বাড়ীতে বৃহৎ বৃহৎ দ্বিতল ইষ্টকালয় ও দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া, এই সাহা জমিদারগণ বসতি করিতেছেন। বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরীর পিতামহী পরলোকগতা ৺ পার্ব্বতী চৌধুরাণী সাধারণের কষ্ট অপনোদন জন্য মাধব-পাশা হইতে বরিশাল পর্যান্ত একটী রাস্তা প্রস্তত করিয়া দিয়াছিলেন; অদ্যাপি ঐ রাস্তাকে "পার্ব্বতী চৌধুরাণীর রাস্তা" বলিয়া থাকে। ঐ রাস্তা বর্ত্তমানে বাখরগঞ্জ ডিষ্ট্রীক্টবোড গ্রহণ করিয়া মেরামত করতঃ ইহার অস্তিত্ব রক্ষা করিতেছেন। ৺ পার্ব্বতী চৌধুরাণী হিন্দুর পবিত্র তীর্থ শ্রীবৃন্দাবনধামে এক দেবমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তথায় ৺ কালাচাঁদ নামে একটী বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছেন এবং একটী কৃত্রিম কুঞ্জবন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; অদ্যাপি তথায় তৎকৃত অতিথিশালা ও উক্ত বিগ্রহের অর্চ্চনা চলিতেছে। তিনি বৃন্দাবনধামে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া, তথায় মানবলীলা সম্বরণ করেন। মাধবপাশাতে ৺ পার্ব্বতী চৌধুরাণী কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কারুকার্য সমন্বিত ২৪ চাকাবিশিষ্ট একখানি রথ প্রস্তত করিয়া তাহা চালাইতেন। তাঁহার লোকান্তরেও কিছুদিন উক্ত রথের অস্তিত্ব ছিল; কিন্তু রাজকুমার বাবুর বিবাহের সময় উক্ত রথগৃহে বাজীর আগুন্ পড়িয়া রথখানি ভস্মীভূত হইয়া যায়। রামমাণিক্য সাহা একজন পর-দুঃখ-কাতর ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সাধারণের কষ্টের কথা অবগত হইয়া বহু অর্থ ব্যয়ে বরিশালের পূর্ব্ব-দিকে সাহেবের হাট হইতে ওটমপুরের নদী পর্য্যন্ত একটী ভারাণী খাল

কাটাইয়া দিয়াছিলেন; লোকে অদ্যাপি এই খালটীকে রামমাণিক্যের ভারাণী বলিয়া থাকে। সাম্প্রতিক এই খালটী মজিয়া যাওয়ায়, স্থানীয় ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পুনরায় উক্ত খালটীর পঙ্কোদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। রাধাচরণ বাবুর বাড়ী হইতে প্রতি বৎসর দুর্গাসাগরের উত্তর-পাড়ে চৈত্র বৈশাখমাসে পথক্লিষ্ট পথিকগণের কষ্ট প্রশমনার্থে জলছত্র দেওয়া হইয়া থাকে, তাহাতে পথিকগণ প্রত্যেকে আহার্য্যার্থ এক গ্লাস জল, কিছু মিষ্ট ও কিছু ফল পাইয়া থাকেন; উহাতে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর পথিকের ক্ষণিক শ্রান্তি দূর করিয়া থাকে। উক্ত জমিদার বাড়ী একটী পোষ্টাফিস ও একটী বঙ্গ বিদ্যালয় স্থাপিত আছে। ইহাদের বাড়ী বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়। বাবু রাধাচরণ রায় চৌধুরী প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে একটী নিয়ম-সেবার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাতে একমাসকাল বহু বৈষ্ণব ও কাঙ্গালী ভোজন করিয়া থাকে।

তৌজী নম্বর ১৭২১—১৭২২।

উল্লিখিত দুই তৌজীর মালিক রাজা স্যার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের অংশ বর্ত্তমানে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের শাসনাধীন আছে। জিলা চব্বিশ পরগণার কালেক্টর সাহেব কর্ত্তৃক নিযুক্তিয় বাবু কৈলাসচন্দ্র দাস বর্ত্তমান ঠাকুর ওয়ার্ড ষ্টেটের ম্যানেজার। ১৭২১ ও ১৭২২নং তৌজীর বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল;—বঙ্গাব্দ ১২০২ সালে চন্দ্রদ্বীপের রকম ৵১২॥ গণ্ডা অংশ নীলাম হইলে মিঃ জন্ পেনেটী খরিদ করেন, তাহা নিয়া ১৭২১নং তৌজী গঠিত হয়। ১২০৪ সালে ৵১৭॥ গণ্ডা অংশ উক্ত পেনেটী সাহেব খরিদ করেন, তদ্দ্বারা ১৭২২নং তৌজী গঠিত হয়। উক্ত নীলাম খরিদের পরে পেনেটী সাহেবের ওয়ারিশসূত্রে তদীয় দৌহিত্র ফুলী সাহেব উক্ত ।/১০

আনি অংশের ষোল আনি রকমের ।/১৩।/ ক্রান্তি অংশ প্রাপ্ত হন। মিঃ পেনেটী সাহেব ভাগ্যকুল নিবাসী বর্ত্তমান রায় সীতানাথ রায় বাহাদুরের পূর্ব্বপুরুষ মথুরামোহন রায়ের সরকারে কতক দেনা ছিলেন, উক্ত দেনার দায়ে উক্ত মথুরামোহন রায় হিস্তে ।৴১৩।/ ক্রান্তি অংশ নীলাম খরিদ করেন। উক্ত ফুলী সাহেবের ।/১৩।/ ক্রান্তি অংশ হইতে নিক্‌লিস্‌ কালানুন্‌ সাহেব ৴১৭॥/৴১০ দন্তি অংশ প্রাপ্ত হন; পরে ঐ অংশ বাইশরশির জমিদার নীলকণ্ঠ বাবু ও বৈকুণ্ঠরাম বাবু খোষ খরিদ করেন। উক্ত ৴১৭॥/৴১০ ডিসিম অংশ বাদে বাকী ৸৶২।১০ ডিসিম অংশ রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মিঃ জন্‌ পেনেটী ও মিঃ ফুলী সাহেব এবং মথুরামোহন রায় হইতে খরিদ করেন। উক্ত দুই তৌজীর অন্যতম স্বত্বাধিকারিণী শ্রীযুক্তা কামিনীসুন্দরী চৌধুরাণী এবং শ্রীযুক্তা মঞ্জুরী চৌধুরাণী ফরিদপুর জিলার অধীন বাইশরশি নিবাসী পরলোকগত স্বনাম প্রসিদ্ধ নীলকণ্ঠ রায় চৌধুরীর পুত্রবধূ এবং শ্রীযুক্তা শিবসুন্দরী চৌধুরাণী উক্ত বাইশরশী নিবাসী পরলোকগত বৈকুণ্ঠ-রাম রায় চৌধুরীর পুত্রবধূ। বরিশাল জিলায় ইহারা প্রসিদ্ধ জমিদার বলিয়া খ্যাত। ইহাদের বরিশালস্থ জমিদারীর আয় লক্ষ টাকার উপরে হইবে। পটুয়াখালী মহকুমার অধীন বাউফলে ইহাদের সদর কাছারী সংস্থাপিত আছে; এজন্য ইহাদের বরিশালস্থ জমিদারীকে বাউফল ষ্টেট বলিয়া থাকে।

১৭২৩নং তৌজী।

বরিশাল টাউনের জমিদার বাবু শ্রীব্রজনপ্রসাদ বর্ম্মণের পূর্ব্বাধিকারী পরলোকগত বাবু দলসিংহ বর্ম্মণ বঙ্গাব্দ ১২০০ সালের শেষভাগে ঢাকা কালেক্টরীর প্রথম নীলামে বর্ত্তমান চন্দ্রদ্বীপ পরগণার ৴১৭॥/৴ ক্রান্তি অংশ

খরিদ করেন। তৎকালীন বাখরগঞ্জ জিলার সৃষ্টি হয় নাই। বাবু দলসিংহ বৰ্ম্মণ চাকরী উপলক্ষে পঞ্জাব প্রদেশ হইতে বঙ্গোদেশে আগমন করেন। * তিনি প্রথমতঃ উত্তর বঙ্গের নাটোর রাজসরকারে মুন্সীসরকারের পদ গ্রহণ করেন এবং তথায় চাকরী উপলক্ষে লগ্নি ও জহরতের ব্যবসা আরম্ভ করেন। তৎপর তথাহইতে উক্ত কারবার উঠাইয়া ঢাকায় আসিয়া উয়ারীতে এক বৃহৎ হাবেলী প্রস্তুত করেন ; অদ্যাপি ঢাকাতে উক্ত হাবেলী দলসিংহ বাবুর হাবেলী বলিয়া প্রসিদ্ধ। ১২০০ সালে তিনি চন্দ্রদ্বীপের জমিদারী খরিদ করেন। ক্রমে বাবু দলসিংহ বৰ্ম্মণ, বাবু গোপালকৃষ্ণ বৰ্ম্মণ রাণী গোলাপ দেবী, রাণী সর্ব্বমঙ্গলা দেবী, বাবু রাজকৃষ্ণ বৰ্ম্মণ, বাবু নিরঞ্জন প্রসাদ বৰ্ম্মণ জমিদারী শাসন করিয়া গিয়াছেন। বাবু নিরঞ্জনপ্রসাদের পরে তাঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী শিবদেহী এবং তৎপরে রাণী জ্বালাদেহী বৰ্ম্মণী জমিদারী শাসন করিয়া গিয়াছেন। বৰ্ত্তমানে বাবু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বৰ্ম্মণের শাসনাধীনে উক্ত জমিদারী ন্যস্ত আছে। দলসিংহ বৰ্ম্মণ হইতে আটজন উত্তরাধিকারীদ্বারা ইহাদের জমিদারীর শাসন চলিয়া আসিতেছে। নিম্নে তাহার একটী তালিকা প্রদত্ত হইল ; যথা—(১) দলসিংহ বৰ্ম্মণ, (২) রাণী গোলাপ দেবী (স্বামী মৃত দলসিংহ বৰ্ম্মণ), (৩) রাণী মঙ্গলা দেবী পিতা মৃত দলসিংহ বৰ্ম্মণ (স্বামী মৃত বিশ্বেশ্বর বৰ্ম্মণ), (৪) বাবু রাজকৃষ্ণ বৰ্ম্মণ

* কেহ কেহ বলেন বাবু দলসিংহ বৰ্ম্মণ চন্দ্রদ্বীপ রাজসরকারে কিছুকাল চাকরী করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই চন্দ্রদ্বীপ জমিদারী সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল এবং তজ্জন্য তিনি এই দূর প্রদেশস্থ ভূসম্পত্তি নীলাম খরিদ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ রাজবাড়ীর চিলছত্রের দক্ষিণাংশে ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের রাস্তার দক্ষিণদিকে এক ক্ষুদ্র ভূখণ্ডকে "দলসিংবাবুর হাবেলী" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

(রাণী মঙ্গলাকর্ত্তৃক গৃহীত দত্তক), (৫) রাণী গঙ্গাদেহী (স্বামী মৃত রাজকৃষ্ণ বর্ম্মণ), (৬) বাবু নিরঞ্জনপ্রসাদ বর্ম্মণ (রাণী গঙ্গাদেহীর গৃহীত দত্তক) (৭) রাণী শিবদেহী (স্বামী মৃত নিরঞ্জনপ্রসাদ বর্ম্মণ), (৮) বাবু শ্রীরঞ্জনপ্রসাদ বর্ম্মণ (উইলসূত্রে প্রাপ্ত)।

বিক্রমপুর ভরাকৈর নিবাসী মল্লিক পরিবারস্থ পরলোকগত গঙ্গাপ্রসাদ মল্লিক, তৎপুত্র ঈশানচন্দ্র মল্লিক, তৎপুত্র কালীপ্রসন্ন মল্লিক পুরুষানুক্রমে বহুদিন দেওয়ানের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। পঞ্জাব নিবাসী বাবু বক্তার লালসিংহ বর্ত্তমানে এই দেওয়ানের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। ইনি একজন স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, কার্য্যদক্ষ, বিনয়ী এবং বঙ্গভাষাভিজ্ঞ ব্যক্তি। বর্ত্তমানে ইহার চেষ্টা ও যত্নেই এই ষ্টেট এক্ষণতক্ বজায় আছে। বাখরগঞ্জ ষ্টেসনাধীন চড়াদীতে ইহাদের এক কাছারী বাড়ী আছে। এখানে রাণী গোলাপ দেবীর নামানুসারে একখানি পুরাতন হাট আছে, এজন্য এস্থানকে রাণীর হাট বলে এবং স্থানীয় পোষ্টাফিসের নামও রাণীর হাট বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে। বরিশালের বাজারটী এই জমিদারীর অন্তর্গত। বরিশালের কাছারী বাড়ীতে ৺ কালীর মন্দির আছে, প্রত্যহ সরকারী ব্যয়ে এখানে পূজা, অর্চ্চনা ও ভোগ দেওয়া হইয়া থাকে।

প্রবীণ ব্যক্তিগণের অভিমত।

জিলা বাকরগঞ্জের সুযোগ্য এডিশনাল ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রকুমার ঘোষ এম্ এ. মহাশয় লিখিয়াছেন,—

পৃথিবীর সকল সভ্য জাতিই তাঁহাদের প্রাচীন গৌরবের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। সে গুলিতে যে শুধুই কেবল সত্য কথা লেখা আছে, তাহা মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই; কিন্তু পূর্ণ সত্যই হউক আর অর্দ্ধ সত্যই হউক, সকল জাতিই ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। অর্দ্ধ সভ্য আহম্ জাতিরও স্ব-লিখিত ইতিহাস আছে; নাই কেবল হিন্দুর। রাজ-তরঙ্গিণী প্রভৃতি দুই চারিখানি যাহা আছে তাহাও নগণ্য। হিন্দু পুরাণ লিখিয়া গিয়াছেন, মহাকাব্য লিখিয়াছেন; কিন্তু ইতিহাস বলিলে আমরা যাহা বুঝি, তাহা লিখেন নাই। হিন্দু পুরাণকেই ইতিহাস বলিতেন; কিন্তু আমরা ইতিহাস বলিলে History, বুঝি। এই জিনিষটাই হিন্দুর কোন কালে ছিল না। এ কলঙ্ক আমাদের রাখিবার স্থান নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-দিগের গবেষণায় আমরা দেশের অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইয়াছি ও হইতেছি। এজন্য তাঁহাদের কাছে আমরা কৃতজ্ঞতার ঋণে চিরঋণী। ভগবান্ তাঁহাদের মঙ্গল করুন। আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, আমাদের মধ্যেও দুই একজন আজকাল তাঁহাদের প্রদর্শিত-পথে চলিতে শিখিয়াছেন। গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা দেশের অনেক কৃতী সন্তান এ দেশের প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতেছেন ও কতক পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থকার তাঁহাদেরই একজন। ইহার অনুসন্ধিৎসা ও অধ্যবসায় দেখিয়া

আমি মুগ্ধ হইয়াছি। ইনি চন্দ্রদ্বীপ-রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার মানসে বহুদিন যাবৎ অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিয়া যে সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা হইতে আমি অনেক নূতন বিষয় শিক্ষা করিলাম। ইতিহাসের ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের এই প্রথম উদ্যম। বর্ত্তমান গ্রন্থে যে সকল সামান্য অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে; আশা করি, ভবিষ্যতে তাহা বিদূরিত হইবে। এ সকল অসম্পূর্ণতা এবং দুই একটি ভুল সত্ত্বেও গ্রন্থখানি উপাদেয় হইয়াছে। ইহাতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। বরিশালকে যাঁহারা ভালবাসেন, বরিশালের প্রাচীন গৌরবকাহিনী যাহারা শুনিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সকলেরই এই গ্রন্থখানি একবার পড়া উচিত।

বরিশাল
২৫শে শ্রাবণ, ১৩২০ সন। (স্বাঃ) শ্রীযোগেন্দ্রকুমার ঘোষ।

দেশপূজ্য শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত এম, এ, বি, এল্ মহাশয় লিখিয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র পুততুণ্ড মহাশয়ের "চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস" দেখিয়া বড়ই প্রীত হইল'ম। তিনি চন্দ্রদ্বীপের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করিতে যে যত্ন ও চেষ্টার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি বাকরগঞ্জবাসিগণের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার্হ। এই পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি। ইহাতে অনেক নূতন তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার সঙ্কলিত তথ্যগুলি যে যে পুস্তক ও দলীল হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার নির্দ্দেশ থাকিলে পুস্তকখানি আরও সুন্দর হইত।

৯ই ভাদ্র, ১৩২০। (স্বাঃ)—শ্রীঅশ্বিনীকুমার দত্ত।

বরিশালের সিনিয়র গবর্ণমেন্ট প্লিডার বঙ্গীয় সা
পরিষদের বরিশাল-শাখা সভার সভাপতি শ্রীযুত বাবু গণেশ
দাসগুপ্ত এম্, এ, বি এল্, মহাশয় লিখিয়াছেন,—

বর্ত্তমান সময়ে অতীতকালের প্রকৃত ইতিহাস জানিবার জন্য অনেকে সমুৎসুক হইয়াছেন; কিন্তু, অতীত ঘটনাবলীর আলোচনা ও অনুসন্ধান করার উপযোগী সুযোগ ও অবসর সকলের ভাগ্যে ঘটে না। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত বৃন্দাবনচন্দ্র পূততুণ্ড মহাশয় বিশেষ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়সহকারে চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের প্রাচীনকাহিনী ও কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়া, এতদ্দেশবাসী জন সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থখানিতে বারভূঞার সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা আছে; প্রাচীন তথ্যের নির্দ্ধারণে ভ্রম-প্রমাদ অনিবার্য্য। অন্যান্য কিংবদন্তীর সহিত তুলনায় সমালোচিত হইলে এবং স্থানীয় অনুসন্ধানের দ্বারা পরীক্ষিত হইলে, ক্রমে সুসংস্কৃত হইয়া গ্রন্থের উৎকর্ষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-শাখা-সমিতিতে গ্রন্থকার যে প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া ক্রমে লেখকের অনুসন্ধিৎসা পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে, ইহা শাখা-সমিতির বিশেষ গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই ইতি।

২০।৮।১৩। (স্বাঃ)—শ্রীগণেশচন্দ্র দাসগুপ্ত

মাদারীপুর মহকুমার প্রথম মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদকান্ত বসু বি. এ, বি, এল্ মহোদয় লিখিয়াছেন.—

মুদ্রাযন্ত্রে প্রেরিত হইবার পূর্ব্বে আমি সৌভাগ্যক্রমে এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি দেখিয়াছি। ইহার কোন কোন অংশ বরিশাল সাহিত্য-পরিষৎ-

প্রবন্ধাকারে পঠিত হইয়া উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর বিস্ময়োৎপাদন ছে। প্রণেতা যেরূপ পরিশ্রম ও আর্থিক ক্ষতি সহ্য করিয়া গ্রন্থের উপাস্ত বিষয় সমূহ নানাস্থান হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি সর্ব্ব-সাধারণের অসংখ্য ধন্যবাদের পাত্র। বরিশালবাসী জনগণ তজ্জন্য বিশেষভাবে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ। চন্দ্রদ্বীপের ভূপতিগণ প্রতিপত্তি এবং রাজ্য-সম্পদে, যশোহরাধিপতিগণ অপেক্ষা কথনও হীন ছিলেন না। গ্রন্থের ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। ইহাতে যে সমুদয় মূল্যবান্ উপাদান সংগৃহীত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একটী লুপ্ত অধ্যায়ের উদ্ধার সাধন করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। বঙ্গদেশের প্রাচীন সমাজের ইতিহাসরূপে এই গ্রন্থ সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবার যোগ্য। আশা করি, স্বদেশ-হিতৈষী মহাত্মাগণ ইহার এক একখণ্ড ক্রয় করিয়া, গ্রন্থকারকে উৎসাহিত করিবেন। গ্রন্থকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের ইহাই সনাতন প্রথা ইতি।

১৬—৮—১৩। (স্বাঃ)—শ্রীকুমুদকান্ত বসু

বরিশাল সদরের ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু সত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল বি, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন,—

মহাশয়! আপনার চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস পাঠ করিয়া, বড়ই প্রীত হইলাম। আপনি অতি সংক্ষেপে অনেক অবশ্য জ্ঞাতব্য ও নূতন তথ্যের সংগ্রহ করিয়াছেন। কেবলমাত্র বরিশাল জিলা কেন, প্রত্যেক বঙ্গবাসীরই এইরূপ ইতিহাস বড়ই আদরের জিনিষ। বাঙ্গালার প্রত্যেক জিলায় এইরূপ ইতিহাস সঙ্কলন হইলে, বাঙ্গালাদেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাস লেখকের পথ অনেক সুগম হইয়া উঠিবে। আপনার এ বিষয় যত্ন ও চেষ্টা বিশেষ প্রশংসার্হ এবং আশা করি, আপনি যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসের যে অভাব, অন্ততঃ তাহা আংশিকভাবেও পূরণ করিতে পারিবেন।

বরিশাল
২৬শে শ্রাবণ, ১৩২০ সন। } বশম্বদ
শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বটব্যাল।

চন্দ্রদ্বীপের বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে কোন কোন গ্রন্থে উল্লেখ দেখা
এবিষয় সুযোগ্য সিভিলিয়ান মহাত্মা বেভারিজ তাঁহার বাকরগঞ্জের ইতি
যে সকল বিষয় লিখেন নাই, তাহা বৃন্দাবন বাবু সংগ্রহ করিয়াছে
আমাদের বরিশাল জেলার সাহিত্য-সেবিগণ মধ্যে বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র পূতত্ত
মহাশয়ের প্রতিভা আছে। তাঁহার এই গ্রন্থে বারভূঞার সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সম্বলিত যে সকল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা অতীব প্রশংসার্হ।
বৃন্দাবন বাবু ইতিপূর্ব্বে তাঁহার প্রণীত কৌলীন্য-প্রথা পুস্তকদ্বারা সমাজের
উপকার সাধন করিয়াছেন। বর্ত্তমানে চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাসে তাঁহার শ্রম-
শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া, বিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছেন।

বরিশাল
১লা ভাদ্র, ১৩২০ সন। } শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
কাশীপুর-নিবাসী পত্রিকার সম্পাদক।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্-সভার জনৈক সভ্য এবং বরিশাল
শাখা-পরিষদের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু দেবকুমার রায়চৌধুরী
মহাশয় লিখিয়াছেন,—

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র পূতত্ত মহাশয় রচিত "চন্দ্রদ্বীপের ইতিহাস"
আমি আনন্দের সহিত পাঠ করিয়াছি। ইহার প্রথমাংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-
পরিষৎ-বরিশাল-শাখার অন্যতম মাসিক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল এবং
প্রকৃত পক্ষে পরিষৎ শাখার অনুমোদনে উৎসাহিত হইয়াই লেখক মহাশয়
এই পুস্তক অদ্য পূর্ণাকারে প্রকাশিত করিয়া, বরিশালবাসীর কৃতজ্ঞতা
অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছেন। গ্রন্থকারের ইহাই প্রথম প্রয়াস; সুতরাং
এ পুস্তকখানিতে ভাষা ও রচনা বিন্যাসের কথঞ্চিৎ ত্রুটি যে পরিলক্ষিত না
হইবে, এরূপ আশা করা যায় না। কিন্তু, তৎসত্বেও একথা স্বীকার
করিতেই হইবে যে, এ পুস্তক প্রণয়নে বৃন্দাবন বাবু যেরূপ অক্ষুণ্ণ অনু-
সন্ধিৎসা ও অধ্যবসায় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বস্তুতঃ সাহিত্যিক মাত্রেরই
একান্ত অনুকরণীয়। বহু জ্ঞাতব্য তথ্যপূর্ণ, এই উপাদেয় ইতিহাসখানি
বঙ্গদেশে সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইবে ভরসা করি।

২রা ভাদ্র, ১৩২০। (স্বাঃ)—শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী,